প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৩,

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
১৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূ চি প ত্র

নয়নতারা ফুল

প্রভাত আলোর পরশ লভিয়া
নয়নতারারা নয়ন মেলিয়া
একে একে সবে উঠিল ফুটিয়া
কানন উজল করি—
শ্বেত ও গোলাপি দ্বিবিধ বরন
অপরূপ শোভা করিয়া ধারণ
প্রণাম জানায় নবীন রবিরে
কৃতজ্ঞতায় ভরি।
দেব-অনুরাগে চরণ পূজিতে
জনম তাহার এই ধরণীতে
রাশিরাশি ফুটে কানন উজলি
প্রাণের হরষ ভরে!
পূজায় করিয়া প্রাণ নিবেদন
সার্থক করে আপন জীবন—
জন্মান্তরে নবরূপ ধরে
পুনঃ আগমন তরে!

তৃণ

হরিৎ বরন ক্ষুদ্র তৃণগণ
শ্যামলিমা দিয়া ধরণীরে
করে আবরণ—
মেদিনীর ক্ষয় রোধিবারে

বুঝি ধরা 'পরে
তাদের জনম!
মৃত্তিকায় জনমিয়া
ভরি রাখে বসুধার হিয়া
রুক্ষতার বিনাশ সাধিয়া।
ক্ষুদ্র তৃণ তবু তুচ্ছ
নহে সে কখন,
স্রষ্টার সামান্যতম সৃষ্টি
সে-ও নহে অকারণ!
সুবিশাল মহীরুহ যাঁহার সৃজন
তুচ্ছ তৃণদলে
অবহেলা ভরে তিনি
সৃজেনি কখন।
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হীন ও মহৎ
সামান্য ও অসামান্য
জগৎ মাঝারে হেরি যত—
বিনা প্রয়োজনে
হয় নাই কভু
তাহারা সৃজিত।
বিধাতার সৃষ্টি যত
প্রতিটি তাঁহার অভিপ্রায়
সাধিছে নিয়ত।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব মোরা
বিধাতার যত কার্য ও কারণ
বুঝিবার মিথ্যা চেষ্টা
করি অকারণ।
শান্ত মনে ধীর চিত্তে
তাঁর কার্য যত—
মানিয়া লইতে হবে
মাথা করি নত!

বিল্বফল

সুপবিত্র বিল্ববৃক্ষ শিবের আবাস—
এই সত্য সাধারণে
করেন বিশ্বাস।
দেবতার পূজা-উপচারে
বিল্বপত্র অবশ্যই রয়—
উহা বিনা কোন পূজা
সিদ্ধ নাহি হয়।
বিল্বপত্রে মাল্য রচি
শিবের পূজায়—
ভক্তিযুত চিত্তে পূজাকারী
শিবেরে পরায়।
শিবের পূজার তরে
ফল আর পত্র সবে
করে আহরণ—
যেই উপচারে সদাশিব
সদা তুষ্ট হন।
পঞ্চবটী মধ্যে বিল্ববৃক্ষ
অন্যতম—
যাহার বিহনে উহা
হয় না সৃজন।
সুস্বাদু বিল্বের ফল
সকলের প্রিয়—
গৃহ-আঙ্গিনায় শোভে
বৃক্ষ রমণীয়।
গ্রীষ্মের সময়ে পানীয়ের রূপে
বিল্বফল হয় ব্যবহার—
তৃপ্ত হয় দেহমন
পানেতে উহার!
পূজা-উপচারে কিংবা ভোজনের তরে
বিল্বফল সমাদৃত

সকলের ঘরে।
পুষ্টি আর তুষ্টি এই ফল
দেয় আনি—
সে কারণে বিল্বফলে
সকলে বাখানি!

শিশু

শিশুর জীবন
নিষ্কলঙ্ক পুষ্পের মতন—
বিশ্বের সকলে তার
একান্ত আপন!
ভূমিষ্ঠ হইয়া আপনার মনে
আপনার সনে খেলে শিশু
আনন্দে মাতিয়া।
অতি ধীরে ধীরে
বুঝিতে পারে সে জননীরে—
স্তন্যদানে যে তাহারে
পরিতৃপ্ত করে।
সরলতা ভরা তার
হাসির রেখায়
হৃদয়ের অনাবিল ছায়া
দেখা যায়।
সরল বিশ্বাসে আপন ও পর
প্রভেদ ভুলিয়া—
সকলেরে নেয় টানি
আপন বলিয়া।
বিশ্বপিতা নিজে বিরাজ করেন
প্রতি শিশুর অন্তরে—

হিংসা ঘৃণা স্বার্থবুদ্ধি
পড়ি থাকে দূরে!
জীবনের শ্রেষ্ঠকাল
শৈশব সময়—
মানুষ ও দেবতায়
প্রভেদ না রয়!

নাতি

দিবানিদ্রা ত্যজি বসিলাম
ঘরের বাহিরে—
"দিদা" বলি ডাক শুনি
চাহিলাম ফিরে।
পাড়ার কিশোর নাতি
ডাকিতেছে মোরে
আপনার সাথী বলি
জানে সে আমারে।
অবসর পেলে ছুটে আসে
মোর ঘরে—
আনন্দেতে
খেলাধুলা ভুলে।
বিবিধ বিষয়ে জানিবার
আগ্রহ প্রচুর—
সাধারণ বালক হইতে তার
স্বভাব মধুর!
পড়াতে প্রথম হয়
প্রতি বৎসরেতে
আনন্দে নিষ্টান্ন তারে
খাওয়াই যত্নেতে।

অঙ্কন বিদ্যায় তার
জুড়ি নাহি হয়—
বহুবিধ পুরস্কারে
ঘর ভরি রয়।
এ-হেন নাতিরে যেতে হল
বাড়ি ছেড়ে—
ভাল বিদ্যালয়ে
ভাল পড়াশুনা তরে।
নাতিরে না-দেখি মোর
হৃদয় চঞ্চল—
নাতিরও দিদার লাগি
অন্তর বিকল!
স্নেহের বাঁধনে বাঁধা
পড়েছি দু'জনে—
একের ভাবনা অন্যে
ভুলিব কেমনে?
বিদ্যালয় অবকাশে
যবে দেখা মিলে
আনন্দসাগরে ভাসি
আপনারে ভুলে!

জীবন

অখণ্ড চৈতন্য নিজ লীলায় মাতিয়া
রচেছেন মহাবিশ্ব নিজ শক্তি দিয়া।
চৈতন্যসাগরে বুদ্বুদের প্রায়
তাঁর সৃষ্ট জীব যত ঘটরূপে
ভাসিয়া বেড়ায়।

অন্তরে বাহিরে তার চৈতন্য ব্যতীত
নাই কিছু আর—
মায়া-আবরণে জীব জানে না
স্বরূপ আপনার!
মন-বুদ্ধি-চিত্ত আর অহংকার বেশে
মায়া তার স্বরূপেরে গ্রাসে।
মায়াময় ঘট-দেহ লয়ে
মায়ার সংসারে—
মিথ্যা সুখদুঃখ মাঝে
থাকে জীব আপনা হারায়ে।
সংসার মাঝারে বাসকালে
আপন আপন কর্ম অনুসারে
জন্ম-মৃত্যু আবর্তনে
পুনঃপুন চক্রাকারে ঘুরে।
ইতর জীবন হতে অতি ধীরে ধীরে
বহু জন্ম পরে স্রষ্টার কৃপায়
মানব জীবন লভি
বুঝিতে পারে সে আপনায়।
তখন সে ব্যাকুল হইয়া খোঁজে
দেহ-ঘট হতে মুক্তির উপায়।
শক্তিরূপে চৈতন্য তখন
জীবগণে উদ্ধারের তরে—
আসেন কৃপায় এ মরতে
গুরুরূপ ধরে।
গুরুর কৃপায় বহু তপস্যায়
অবশেষে অনুভবে বুঝিতে পারে
সে আপনায়।
স্ব-স্বরূপ অনুভব করি ঘট-দেহ ছাড়ি
চৈতন্যসাগরে মিশি যায়—
লবণপুত্তলিপ্রায় লবণসাগরে পশি
আপনা হারায়!

মায়া

শৈশব হইতে মায়ার সংসারে
মায়ামুগ্ধ হয়ে কেটেছে জীবন—
বুঝিতে পারিনি, হায়, মায়ার ছলনে ভুলি
হেলায় হারায়ে গেছে সময় কখন।
আজি জীবন-সায়াহ্নে বুঝিয়াছি মনে
একমাত্র নিত্যসত্য ভগবানে জানিবার তরে
মহামূল্য মানব জনম এ সংসারে।
কোটি কোটি ইতর জনম ভোগ করিবার পরে
বহু ক্লেশে পাইয়াছি যাহা এই বারে।
সার্থক করিতে এই মনুষ্য জনম—
ভগবৎ অনুরাগী হয়ে নিশিদিন তাঁরে স্মরি
সকল বাসনা পরিহরি
কাটাইতে হবে এই অন্তিম লগন।
তাঁর কৃপাতরে ব্যাকুল অন্তরে তাই
প্রার্থনা জানাই অনুক্ষণ।
একমাত্র তাঁর কৃপা মানব জীবনে অমূল্য রতন
কৃপা বিনা ভগবৎ অনুভূতি লাভ
কারও হয় না কখন।
একান্ত অন্তরে তাই দিবানিশি
প্রার্থনা জানাই সকাতর চিতে—
মোহময় মায়া আবরণ দূর করি
তাঁর পদে আশ্রয় দানিতে।
অন্তর্যামী ভগবান যদি কৃপা করি
দূর করি দেন এই মায়া-আবরণ—
তাঁর অনুভূতি দানে কৃতার্থ করেন
মোর এই মনুষ্য জনম,
এই আশা লয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে
কাটাই এ জীবনের অন্তিম লগন!

মুক্তি

জীবগণ সংসারে আসিয়া
স্রষ্টার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে
ভোগ করে সংসার জীবন
"আমি ও আমার" এই ভ্রান্ত চিন্তা লয়ে।
আপন সংসার গৃহ-পুত্র-পরিবার তরে
জীবন ভরিয়া প্রাণপণ যত্ন
আর চিন্তা-চেষ্টা করে।
আপন আপন সুখ-স্বাস্থ্য-সম্পদ লাগিয়া
সহস্র চিন্তার জালে থাকে জড়াইয়া।
আপনি ও আপনার পরিজন ছাড়া—
অন্য কারও তরে অন্তর মাঝারে
নাহি জাগে সাড়া।
মৃত্যুকালে আপনার পুত্র আর পরিবার স্মরি—
আকুল অন্তরে বিষাদ-সাগরে ডুবি
যায় প্রাণ ছাড়ি।
স্বরূপ-বিস্মৃত বদ্ধ জীবগণ এইরূপে
নিত্যসত্য ভগবানে ভুলি
পড়ি থাকে অনিত্য এ সংসারের
মোহময় কূপে।
স্রষ্টার কৃপায় যদি মোহমুক্তি
ঘটে ধীরে ধীরে—
"তুমি ও তোমার" এই সত্য অনুভূতি
জাগে তাহার অন্তরে।
বুঝিতে সে পারে—
তুমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি প্রভু জগতের,
আমি ও তোমার আর মোর পুত্র-পরিবার
গৃহ, ধন-আদি সকলি তোমার।
এ সংসার কর্মক্ষেত্র সকল জীবের
শুধুমাত্র দু'দিনের তরে—

কর্ম শেষ করি পুনঃ
যেতে হবে ফিরে।
"তুমি ও তোমার" এই সত্যজ্ঞান হলে
বিদ্যার সংসার করিতে পারিবে
অবহেলে।
মৃত্যু হেরি শোকাতুর হইবে না কভু—
দাস বলি জানিবে নিজেরে
সৃষ্টিকর্তা প্রভু!
এইরূপে মোহমুক্ত হইতে পারিলে
আপন জীবনে মুক্তির অমৃত স্বাদ
লভিবে সে কালে!

সত্য

এ ঘোর কলিতে সুকঠিন সত্যেরে
আশ্রয় করি থাকিতে যে পারে—
ভগবৎ কৃপা বর্ষিত হইবে
তার শিরে!
সৃষ্টিকর্তা ভগবান সত্যের স্বরূপ—
সেই সত্যে জীবগণ হইয়া বিস্মৃত
ভুগিতেছে মহাক্লেশ
শোকে তাপে হয়ে জর্জরিত।
ভুলেছে তাহারা সত্যমূর্তি ভগবানে
আশ্রয় করিতে—
একনিষ্ঠ চিতে
সত্যে অনুরাগী হতে।
জীবনে-মরণে সত্যেরে যে করে ধ্রুবতারা-
নিত্যানিত্য ভগবানে সে কখনও
হইবে না হারা।

কলিঘোরে সমাচ্ছন্ন যত জীবগণ
সত্যে ভুলি মিথ্যার আশ্রয়
করেছে গ্রহণ।
মিথ্যা বাক্য মিথ্যা চিন্তা
অন্যায় ও অসত্যে বরিয়া—
সীমাহীন যন্ত্রণা ও মরণ অধিক তাপে
মরিছে জ্বলিয়া।
সত্য আর ভগবানে অভিন্ন জানিয়া
পূজিতে হইবে সত্যে প্রাণমন দিয়া।
সরলতা সত্যকথা কলির সাধনা—
ইহা ভিন্ন কলিজীব উদ্ধার হবে না।

ভক্তি

ভালবাসা স্বর্গীয় সম্পদ—
মানব হৃদয়ে উহা অতুল বিভব।
কনিষ্ঠের প্রতি ভালবাসা
"স্নেহ" নাম ধরে—
সঙ্গীগণে অনুরাগ
"ভালবাসা" বলি তারে।
বয়োজ্যেষ্ঠে প্রণতি জানাই
"শ্রদ্ধা" সহকারে—
ভগবানে অনুরাগ
"ভক্তি" বলি তারে।
ভক্তির সমান কিছু নাই
এ জগতে—
ভগবান বাঁধা পড়ে
ভক্তির রজ্জুতে!

নম্রতা ও কোমলতা
　　জাগে ভক্তি হতে—
ভক্তির সমান গুণ
　　হয় না মরতে।
ক্রোধ-আদি রিপু বশ
　　হইবে ভক্তিতে—
ভগবান প্রতিষ্ঠিত
　　ভক্তের চিত্তেতে।
ভক্তির শ্রেষ্ঠতা হেরি আত্মনিবেদনে—
　　ভগবান তাঁর ভক্তে আপনা হইতে
　　　　বড় মানে।

নরনারায়ণ

যুগ প্রয়োজনে
　　আবির্ভূত হন হরি নররূপ ধরি
　　　　এই মর্ত্যভূমে!
নররূপী নারায়ণে
　　চিনিতে পারে না সাধারণে।
আকৃতি ও আচরণে মনে হয়
　　যেন সামান্য মানব—
তাঁর অতি-মানবতা জনগণ
　　পারে না করিতে অনুভব!
ভাগ্যবান পূতচিত্ত অতি অল্পজন—
　　সঙ্গ লভি ক্রমে বুঝে তাঁরে,
　　　　সাধারণ হতে ব্যতিক্রম।
সাধারণ আকার ও ব্যবহার মাঝে
　　অনন্য সুন্দর দিব্য-ব্যক্তিত্ব বিরাজে!

জ্ঞানচক্ষে এই দিব্যভাব ধরা পড়ে
ভগবৎ অনুরাগী কতিপয় শুধু
পারে চিনিতে তাঁহারে।
মানব অন্তর হতে পাশব প্রবৃত্তি নাশি
ধর্ম প্রতিষ্ঠিতে—
জন্ম লন তাঁরা ধরণীতে।
যুগ-অনুযায়ী তাঁহাদের কর্মধারা
পায় স্বতন্ত্র প্রকাশ—
অসুর নিধন কিংবা
আসুরিক প্রবৃত্তির নাশ।
মর্ত্যভূমি ত্যজি যবে যান তাঁরা চলি
কর্ম-অবসানে—
সাধারণে তার বহু পরে সক্ষম কখনও হয়
তাঁর মূল্যায়নে।
যুগ-অবতার বলি প্রচারে তাঁহারে
ক্রমে স্থান পান তাঁরা
জনগণের অন্তরে।
প্রতি যুগে এ জগতে অবতারগণ
জন্ম লন—
ব্যক্ত কিংবা গুপ্তরূপে থাকি
করেন মহান উদ্দেশ্য সাধন!
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে এই আগমন
চলিতেছে যুগ হতে যুগে—
প্রয়োজন তাঁহাদের কভু
না ফুরাবে।
জহুরির প্রয়োজন জহর চিনিতে—
নরনারায়ণে চিনে
যথার্থ ভক্তেতে!

শ্মশান

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থান
এ শ্মশান!
সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিবারে
জ্ঞানিগণ করে হেথা ধ্যান।
এখানে আসিলে মানুষে মানুষে নাহি রহে
ব্যবধান—
উচ্চ-নীচ ধনী ও নির্ধনে
লভে একই পরিণাম!
বদ্ধজীব সংসার মাঝারে
ফিরে সুখের সন্ধানে—
সহস্র কামনাজালে জড়াইয়া
পড়ে সহস্র বন্ধনে!
মৃত্যুরে পড়ে না মনে তার
চিরস্থায়ী ভাবে এ সংসার।
মহানন্দে ভোগ করিবারে চাহে
অনিত্য এ মোহের আগার।
শ্মশানে আসিয়া সংসার অনিত্য
জ্ঞান হয়—
কিন্তু এই জ্ঞান দীর্ঘদিন
নাহি রয়,
"শ্মশান বৈরাগ্য" তারে কয়।
মানুষের জীবনের শেষ পরিণাম
লভিবার স্থান এ শ্মশান।
মোহময় সংসার জীবন
পদ্মপত্রে জলের সমান—
শ্মশানে আসিয়া নর
লভে সেই জ্ঞান।
প্রজ্বলিত শ্মশান-অনলে দগ্ধ হয়ে
সকল বাসনা লভিবে বিরাম।
জীবন ভরিয়া যেই দেহসুখ তরে

মানুষেরা প্রাণপণ করি
যত্ন করে—
সেই অতিপ্রিয় দেহ লুপ্ত হয়
শ্মশান মাঝারে।
শুধু নাভিমূল আর চিতাভস্ম
রহে পড়ে!

শতরূপা জননী

চিন্ময়ী জননী ভগবতী দেবী
মর্ত্যবাসী তব সন্তানের
কাতর আহ্বানে—
কৃপায় নামিয়া এসো মর্ত্যের মাটিতে
গ্রহণ করিতে পূজা প্রতি বর্ষে
নবনব বিচিত্র রূপেতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে পুণ্যতিথি দশহরা দিনে
গঙ্গামাতারূপে তোমা পূজে
ভক্তগণে।
তব কৃপা লভি তারা আপনারে
ধন্য বলি মানে।
আষাঢ়ের ঘনঘোর বরিষার কালে—
পূজে তোমা ভক্তিভরে
কামাখ্যা জননীরূপে
ভক্তগণে মিলে।
শ্রাবণের ধারা নামি যবে ধরা ভাসে
সেই পুণ্য নাগপঞ্চমী দিবসে—
দেবী মনসার বেশে
গ্রহণ করিছ পূজা
পৃথিবীতে এসে।

শরৎ ঋতুর শুভ আশ্বিন মাসেতে
শুক্লাতিথি সপ্তমী-অষ্টমী-নবমীতে—
দশভুজা দেবী দুর্গারূপে
পূজে তোমা ভক্তগণ তিনদিন
মহানন্দে মেতে।
পঞ্চম দিবসে সেই শুভ পূর্ণিমা তিথিতে
ভক্তগণ আনন্দেতে মেতে
পূজে তোমা লক্ষ্মীমাতা রূপে ভক্তিভরে-
প্রতি ঘরে ঘরে, আপন আপন সংসারের
শ্রীবৃদ্ধির তরে।
কার্তিক মাসের ঘোর অমানিশা রাতে—
মাতা তুমি করহ গ্রহণ বিধিমতে
যেই পূজা তোমা করে নিবেদন
করালী কালিকা রূপে
মর্ত্যবাসিগণ।
কার্তিক মাসেতে পুনঃ তব আগমন
জগদ্ধাত্রী জননীর বেশে—
গ্রহণ করিতে পূজা তব ভক্তদের
ধরার ধুলায় নেমে এসে।
মাঘের শীতল শুক্লা পঞ্চমীর প্রাতে
স্নান করি পবিত্র অন্তরে
যতনে পূজেন তোমা জ্ঞান লভিবারে—
জগৎবাসীরা দেবী সরস্বতী রূপে
ভক্তিভরে।
চৈত্রমাসে বাসন্তীদেবীর বেশে এসে
করিছ গ্রহণ তিনদিন ধরে—
বৎসরের শেষ পূজা ভক্তগণ যাহা
করে নিবেদন শ্রদ্ধাভরে।
কল্যাণীরূপিণী মাতা সন্তানের মঙ্গলের তরে
প্রতি বর্ষে এসো ফিরে ফিরে
শতরূপে জগৎ মাঝারে।
হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্যে পূজিয়া তোমারে
বৎসর ভরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবীর মাঝারে—

জগতের যত ভক্তগণ
সার্থক করিয়া তোলে
মানব জনম!

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

স্রষ্টা ও তাঁহার সৃষ্টি ভিন্ন
তবু অভিন্ন দু'জন—
স্রষ্টা তাঁর যত ভাব সৃষ্টিরূপে
করেন চিত্রণ।
স্রষ্টা সে বিরাট শিশু
মনে তাঁর হয় যত ভাবের উদয়,
বিবিধ বিচিত্র চিত্র রচি
দেন তিনি তার পরিচয়!
তাই দেখি এই মহাবিশ্বে
এত বিচিত্র সৃজন—
অনন্ত আকাশ আর কোটি কোটি
নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ অগণন।
নিঃসীম গগনতলে দৃষ্টি সীমানায়
অন্তহীন নক্ষত্রের মেলা দেখা যায়।
স্রষ্টার কল্পনামাত্র এ বিশ্ব ভুবন—
অপূর্ব সৃজন যাহা না হয় বর্ণন!
এ বিপুল সৃষ্টি মাঝে অতি তুচ্ছ
আমাদের এ সৌরজগৎ—
যার মধ্যে পরমাণু হতে ক্ষুদ্র মানুষ আমরা
আপনারে করি অনুভব।
জীব আর জগতের যত সৃষ্টি মাঝে
চেতনা ও শক্তির আকারে
স্রষ্টা আপনি বিরাজে।

আপন আনন্দে মাতি আপনারে
সম্ভোগ করিতে—
জীবরূপ ধরি স্রষ্টা লীলায় মাতিয়া
আসেন মরতে।
আত্ম-অনুভূতি সুখ সম্ভোগ-কারণে
জীবরূপী স্রষ্টা আসে
সংসার অঙ্গনে।
সুকঠিন সাধনা করিয়া অবশেষে—
আত্মার সাক্ষাৎ লভি জীবরূপী স্রষ্টা
নিজ স্বরূপেতে মিশে।
লীলায় মাতিয়া যেই আত্মানন্দ সম্ভোগের তরে
জীবরূপ ধরিয়াছিলেন—
সম্ভোগের শেষে পুনরায়
আপনার চিন্ময় স্বরূপে মিলিলেন।

ঘরে ফেরা

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

কিশোর বালক শিবরাম
সহপাঠীদের সনে
গিয়েছিল আনন্দ ভ্রমণে
হিমগিরি পাদমূলে
অনুপম নগরী দার্জিলিং-এ
আনন্দ-ভ্রমণ শেষ করি
দিন কত পরে
সঙ্গী সব গেল ফিরে
যে যাহার ঘরে।
দৈবের বিপাকে শিবরাম
সঙ্গছাড়া হয়ে
রয়ে গেল একা সে শহরে-

সঙ্গীরা কখন গেল
জানিতে না-পেরে।
যখন সে বুঝিতে পারিল
সঙ্গীরা গিয়াছে তারে ছাড়ি
ভাবিতে লাগিল মনে মনে
অসহায় নিরুপায় অজানা এ শহর হইতে
কীভাবে সে একা
ফিরে যাবে বাড়ি?
দিনে দিনে তার ফেরার ভাড়ার টাকা
নিঃশেষ হইল—
শিবরাম প্রমাদ গণিল।
সম্পূর্ণ আজানা এই পাহাড়ি শহরে
অনাহারে প্রাণ তার
বাঁচিবে কী করে?
অবশেষে দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া
সমুখের এক চায়ের দোকানে
"টি-বয়"-এর কাজ নিল জুটাইয়া।
দু'বেলা খাওয়ার বিনিময়ে
দিনরাত খাটিয়া খাটিয়া
আঁখিজলে দিন তার
চলিল বহিয়া।
এইরূপে কিছুদিন যায়
শিবরাম দৈবের কৃপায়
আসিল নজরে এক দয়ালু ব্যক্তির-
দর্শনমাত্রই যিনি বুঝিলেন
শিবরাম নহে দরিদ্র শ্রেণীর।
চেহারায় তার রহিয়াছে ছাপ
বংশ মর্যাদার!
নিকটে ডাকিয়া শিবরামে
জানিলেন তার সত্য পরিচয়—
ফিরাইয়া নিবেন তাহারে
তার নিজ ঘরে,
এ আশ্বাস দিয়া দিলেন অভয়।

যথাকালে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া
শিবরামে আনিলেন
দেশে ফিরাইয়া।
বাড়িতে ফিরিয়া তার আনন্দ না ধরে
স্মরণ করিল বিধাতারে
কৃতজ্ঞ অন্তরে।

করুণা

(২৪-১০-২০০০ সনে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যদর্শন লাভে)

সারদা জননী মাগো, তোমার দর্শন
ঘটেনি আমার—
জন্মিয়াছি আমি তব মর্ত্যতনু
ত্যজিবার পরে।
তাই সকাতরে স্মরেছি তোমারে
একান্ত অন্তরে—
পাই যেন শুধু একবার তোমা দোঁহাকার
পুণ্য দরশন দেহধারী রূপে
মোর এই জীবন মাঝারে।
আজি জীবনের সায়াহ্ন বেলায়
সহসা শুনিনু এই অপূর্ব বারতা
বিস্মিত অন্তরে—
এসেছ নামিয়া তুমি ধরার ধূলিতে
পুনঃ মাতৃরূপে নব কলেবরে।
আসিলে আবার ফিরে শতবর্ষ পরে
পরমা প্রকৃতি তুমি মানবী আকারে—
কৃপা বিতরিতে মরতের পতিত দুর্গত
অসহায় সন্তানগণেরে।
বহুদিন পরে ভাগ্যগুণে যবে লভিনু দর্শন
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীচরণ—

তিনি মোরে কৃপাভিক্ষা
দিলেন তখন।
সেই কৃপাবলে লভিনু দর্শন আজি
এ নয়নে তব শ্রীচরণ!
জননী গো, করুণা করিয়া মোরে
এ জনমে দিয়া দরশন—
করিলে আমার অন্তরের
সুগভীর আকাঙক্ষা পূরণ।
মানিনু সার্থক আজি মোর
মনুষ্য জনম!
তোমার দর্শন তরে যেই ব্যাকুলতা
জেগেছিল আমার অন্তরে—
ভাবিতে পারিনি কভু
আশা মোর হইবে পূরণ।
করুণা করিয়া তুমি অভাবিত রূপে
দিলে সেই বাঞ্ছিত দর্শন!
জননী আমার, করুণায় হয়ে বিগলিতা
তব পূতস্পর্শ দিয়া নিলে মোরে
করিয়া আপন।
চিরজনমের আশ্রিতার রূপে
ও পরমপদে মোরে করিলে গ্রহণ!
ও করুণানদে স্নাত হয়ে
কৃতার্থ মানিনু এই মানব জনম।

শতবর্ষ পরে

আসিলে আবার ফিরে শতবর্ষ পরে
সারদা জননী তুমি মানবী আকারে—

উদ্ধারিতে অসহায় দুর্গত পতিত তোমার সন্তান,
এই জগৎবাসীরে!
আসিয়াছ অতি সংগোপনে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সনে
আবরি স্বরূপ দোঁহাকার
চিনিতে পারেনি তোমা
জগৎ সংসার।
অতি ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রকাশেন
আপনারে সামান্য ক'জন
ভক্ত মাঝে—
যাহারা হইবে ব্রতী জগৎ কল্যাণরূপ
তাঁর সুমহান কাজে।
তাহাদের জানালেন তিনি
শ্রীশ্রীমা তোমার শুভ আবির্ভাব কথা,
ক্রমে মুষ্টিমেয় তব ভক্ত মাঝে
প্রচারিত হল সে বারতা!
আজ তোমা দু'জনার অনুরাগী ভক্তবৃন্দে
জগৎ ছেয়েছে—
দেশে দেশে তোমাদের স্বরূপ-মহিমা
প্রচার হয়েছে।
তাই আজ জেনেছে জগৎ—
"সানাই বাঁশরি" রূপে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর
এসেছেন নিজে—
করুণায় বিগলিতা হয়ে তুমিও এসেছ
শ্রীশ্রীমাতা সেই কাজে।
ওগো জগন্মাতা, করুণার ঘনীভূত রূপে
তোমরা দু'জন এসেছ মরতে—
ভিন্ন "রূপে-নামে" কিন্তু
এক "ভাবে-বোধে"!

পরম পাওয়া

শ্রীশ্রীমা আমার, তোমারে হেরিয়া
আজি তোমার মাঝারে—
পাইলাম আমি মোর একান্ত আপন
মাতা সারদারে।
বহুদিন ধরে যে মাতার তরে ব্যাকুল অন্তরে
মোর কেটে গেছে দিন—
আজ তোমা হেরি জানিলাম মনে
মোর সে জননী তব হৃদয়ে আসীন।
জননী গো, আসিয়াছ তুমি নামি
পুনঃ এ ধরায়—
মনে হয় তাহা শুধু
আমার মায়ায়!
মোর প্রতি একান্ত করুণাবশে
তোমার রূপেতে এসে
জননী সারদা মোরে দিল দরশন—
বুঝিলাম মনে মোর
সফল জনম!
তোমারে হেরিয়া অনাবিল তৃপ্তি আর
শান্তি লভি পূর্ণ হল প্রাণ
পাইয়াছি সারদা মায়ের কৃপা
মনে জানিলাম।
মোর জীবনের পরম যে পাওয়া
তাহা আজ পাইলাম—
অপূর্ব আনন্দে পরিপূর্ণ
হল প্রাণ!

স্বপ্ন না সত্য?

জননী আমার, অপূর্ব স্বপন সম
তোমার দর্শন—
মনে জাগিতেছে অনুক্ষণ!
ভুলিতে পারি না কোনও মতে
তব শ্রীমুখের মোহময়
সেই আকর্ষণ!
জানি না আবার কভু পাইব কি তোমার
এত কাছে এরূপ আপন?
সুদূরে গিয়াছ চলি আমারে ফেলিয়া
মনে হয় ভেঙ্গে গেল
নিশার স্বপন!
দিবানিশি একান্ত অন্তরে মন করে
তোমার চিন্তন—
ভুলিতে পারি না, মাগো,
সুধামাখা তোমার আনন!
জীবনের শেষের বেলায়, কৃপাময়ী মাগো,
তোমার কৃপায়—
লভিলাম মোর আশার অতীত রূপে
তোমার দর্শন—
বুঝিলাম মনে, ধন্য হল এ জীবন!
যাহা পাইলাম আমি তোমার মাঝারে
চিন্তার অতীত তাহা
অনুভবে জাগে বারে বারে।
কৃপাকণা দিয়া সার্থক করিলে
মোর হিয়া—
পরিপূর্ণ হল প্রাণ
তোমারে হেরিয়া!

পারুল

(৮ ডিসেম্বর, ২০০০, পারুল অধিকারীর মৃত্যুতে)

কন্যাসম স্নেহময়ী তুমি মোর,
অকালে চলিয়া গেলে একাকিনী
সুদুর নক্ষত্রলোকে
দৈবের নির্দেশে—
রাখি গেলে শুধু স্মৃতিখানি
স্মরণ-মন্দিরতলে বিদায়ের শেষে!
আশা ছিল মনেতে তোমার—
যাবার বেলায় সেই অজানায়
যাবে একসাথে মোর
হাতখানি ধরে,
সে আশা হোল না পূর্ণ
গেলে চলি একাকিনী
রাখিয়া আমারে।
সংসার মাঝারে ছিলাম আমরা দু'জন
পাশাপাশি দু'জনার ঘরে—
হৃদয় উজার করি আনন্দ-বেদনা যত
জানাতাম মোরা পরস্পরে।
সে সকল দিন আজ স্বপ্নসম
জাগে মোর মনে—
পারি না রোধিতে অশ্রু
নয়নের কোণে!
আজ আমি নিজ ঘরে একেলা
রয়েছি—
তোমার স্মরণে অনুক্ষণ
শোকের সাগরে ডুবে আছি।
স্মরিতেছি ভগবানে একান্ত অন্তরে
তোমার আত্মারে শান্তি দানিবারে।
বুঝিতেছি এই সত্য অন্তরের তলে—
এক সাথে আসা কিংবা যাওয়া

সম্ভব হয় না এ জগতে
কারও কোনও কালে।
দৈবের বিধানে জন্ম ও মরণ কোনও দু'জনার
একসাথে হয় না কখন—
একলা জন্মাতে হবে একাই মরণ,
সে পথে কেহই সাথী পায় না কখন!

স্বপ্না

(২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০০, স্বপ্না বাড়িতে আসায়)

স্নেহময়ী স্বপ্না তুমি,
তোমারে হেরিতে পুনঃ
জেগেছিল সাধ মোর মনে—
সে-সাধ পূরাতে
শ্রীশ্রীমাতা পাঠালেন পুনঃ তোমা
এ সুদূরে মোদের ভবনে!
স্বপ্নসম আকস্মিক তোমার দর্শনে
অভাবিত বিস্ময় ও পুলকের সাড়া
জেগেছিল মোর প্রাণে।
বুঝিলাম অন্তর গহনে—
মায়ের কৃপায় অভাবিত এই
যোগাযোগ ঘটিল এমনে।
তব পুত্র উৎসবেরে আনি
দেখালে আমারে—
বিনম্র-মধুর তার স্বভাব হেরিয়া
লভিলাম আনন্দ অন্তরে।
আনন্দরূপিণী স্বপ্না তুমি,
সে আনন্দ বিতরিতে
এসেছ উৎসব সাথে

এ ভব ভবনে!
মধুময় হল প্রাণ তোমার দর্শনে!
কৃতজ্ঞ অন্তরে তাই
স্মরিতেছি শ্রীশ্রীমা'রে
যাঁহার কৃপায় আজ তোমা সনে
হইল মিলন—
অনাবিল আনন্দে পূরিত হল মন!

কৃপালাভ

ভাগ্যবতী তুমি স্বপ্না,
শ্রীমায়ের কৃপাধন্যা,
লভিতেছ সান্নিধ্য তাঁহার অনুক্ষণ—
মোদের নিকট যাহা দুর্লভ স্বপন!
বহু জনমের পুণ্যফলে হয় যেই
পরমাপ্রকৃতি দরশন—
সেই পুণ্য দরশন
লভিতেছ ভরিয়া জীবন!
কত পুণ্য করিয়াছ না যায় চিন্তন!
তোমাদের ভাগ্যগুণে
এবারে আছেন শ্রীমা
সে সুদূর দেশে—
মোদের দুর্ভাগ্য তাই
কাছে তাঁরে পাই নাই
নিজ দেশ ছাড়ি শ্রীমা
গেলেন বিদেশে!
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের পূত অধিষ্ঠান
এই বঙ্গভূমে—
তাঁরই আকর্ষণে ক্বচিত শ্রীমা'র

শুভ আগমন এইখানে!
মোর জীবনের এই অন্তিম লগনে
বহু ভাগ্যগুণে লভিলাম
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আর শ্রীমায়ের
পুণ্য দরশন—
জানিলাম মনে মোর সফল জনম!
শ্রীমা'র ইচ্ছায় তোমার হেন কন্যা সনে
পরিচিত হইলাম আমি—
জননীর কৃপাধন্যা,
তুমি স্বপ্না অনন্যা,
তোমারে পাইয়া আমি নিজে
ধন্য মানি!

লীলা

সুদীর্ঘ দিনের প্রিয়তমা বন্ধু
তুমি মোর—
কেটেছিল তোমা সনে সংসার অঙ্গনে
কর্মব্যস্ত জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি,
আজ তুমি সংসার ত্যজিয়া
দূরে গেছ চলি!
ভাবিতে পারিনি কোনদিন
স্বামী-পুত্র-কন্যারে ত্যজিয়া অকস্মাৎ
যাবে চলি ভগবৎ আরাধনা তরে—
সুদূর বিহারে
শ্রীশ্রীবামদেবের মন্দিরে!
সংসারে যখন ছিলে
নিরলস হয়ে পূর্ণ মন দিয়ে
করেছ সংসার—

অন্তর অতলে উদাসী বিরাগী মন
সুপ্ত ছিল কেমনে তোমার?
তোমারে দেখিতে মোরা গিয়েছি সেথায়—
শ্রীবামদেবের একনিষ্ঠ সেবিকার রূপে
দেখেছি তোমায়।
আপনারে ভুলি রাত্রিদিন
রত আছ পূজা-ধ্যান মাঝে
হয়ে লীন!
দীর্ঘদিন পরে কখনও এসেছ তুমি
পূর্বাশ্রমে ফিরে ক'দিনের তরে—
দেখা দিতে স্বামী-পুত্র আর আত্মীয়
বন্ধুরে,
যাহারা প্রতীক্ষা করে ব্যাকুল অন্তরে
তোমা তরে।
মায়াময় অনিত্য সংসারে
নিত্যসত্য শুধু ভগবান
যাঁহারে জানিতে মানুষেরে হয়
জন্ম নিতে বারংবার—
ইহা জানি ত্যজিয়া সংসার
রত আছ পূজায় তাঁহার!
ধন্য লীলা, ধন্য বন্ধু মোর,
তোমার পদাঙ্ক অনুসরি
পারি যেন লভিবারে শ্রীভগবানের
শ্রীচরণতরী—
এ আশায় রাখি হৃদি ভরি!

আনন্দময়ী

শরতের সোনালি প্রভাতে
আনন্দময়ীর আগমনী সুর
প্রাণমন করিল মধুর!
শুনি সেই মধুময় সুর
সারা দিক্‌দেশ
হইল পুলকে ভরপুর।
আনন্দ-মুখরা স্রোতস্বিনী
কলকল তানে ধাইয়া চলিল
শোনাইতে সে বারতা
সাগরের কানে।
চঞ্চল বনানী শুনি সেই সুমধুর ধ্বনি
মর্মরিয়া আপনা আপনি
করিতে লাগিল কানাকানি।
নিখিলের প্রাণে ধ্বনিল সে আগমনী সুর
জানিল জগৎ মা'র আগমন
নহে বেশি দূর!
অনাবিল আনন্দের স্রোতে অবগাহি
আকাশ বাতাস জানাল ধরারে—
জননীর আগমন আর নহে দূরে।
কাশবনে শেফালি কাননে
আনন্দের শিহরন
জাগিল কেমনে?
মায়ের আঁচল-ছায়া
বুঝি প্রকাশিল
তাদের নয়নে?
মধু-মধু-মধু
বিশ্ব পরিবেশ হল মধুময়,
জানিল ভুবন প্রাণে প্রাণে
মা'র আগমন আর দূর নয়।

শ্রীশ্রীমা

বিশ্ব-প্রসবিনী পরমাপ্রকৃতি
শ্রীমা তুমি—
পুনঃ এলে অবতরি নব রূপে
নব নামে নব ভাবে
নব পরিবেশে—
তোমারে প্রণমি!
অবিদ্যা-আচ্ছন্ন অজ্ঞান আমরা
তব সন্তান সকলে—
বিগলিত করুণায় পরম করুণাময়
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর
তোমারে চিনালে।
তোমার সন্তান মোরা
জানিলাম অপার বিস্ময়ে—
জীবের কল্যাণ তরে
তোমরা দু'জনে এসেছ মরতে
পুনঃ নব দেহ লয়ে।
এ ঘোর কলিতে ধর্মগ্লানি বিদূরিয়া
জগৎজনেরে উদ্ধারিতে
এসেছ তোমরা
সত্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিতে!
যুগে যুগে নররূপী নারায়ণ সনে
শক্তিরূপা জননী তোমারে
আসিতে হইবে এ ধরায়—
মিলিত চেষ্টায় জীবের অন্তর হতে
অন্যায়-অধর্ম বিদূরিয়া
ধর্ম প্রতিষ্ঠায়!
জগতের প্রাণী যত তোমার সন্তান
জননী তোমার চেষ্টা অবিরত
তাদের কল্যাণ!
তাই বারে বারে অবতরি জগৎ মাঝারে

তব শক্তি দিয়া
সুমহান চেতনার স্রোত বহাইয়া
সন্তানের অন্তর হইতে
অধর্মের গ্লানি করি দূর—
স্থাপন কর যে সেথা
ধর্মের অঙ্কুর!
বিশ্বজন হিত তরে
তোমার এ মহৎ চেষ্টায়
তব লীলাতনু তিলে তিলে
ক্ষয় হয়ে যায়।
তবু যতক্ষণ থাকে প্রাণ
এ চেষ্টার হয় না বিরাম।
ধন্য তুমি বিশ্বের জননী,
তোমারে হেরিয়া অপার বিস্ময় মানি—
বিমুগ্ধ অন্তরে ভক্তিনত শিরে
তোমারে প্রণমি!

আশীর্বাদ

আশীর্বাদ স্বর্গীয় সম্পদ
দেবের বিভব—
প্রিয়জনে কল্যাণ সাধনে
মানুষের আশীর্বাদ মানে পরাভব।
সংসারী মানব পারে না দানিতে কভু
আশীর্বাদ একে অপরেরে—
সে ক্ষমতা ভগবান
দেননি কাহারে।
ভ্রমবশে সাধারণে আশীর্বাদ করে প্রিয়জনে
কিন্তু সেই আশীর্বাদ মূল্যহীন বাণীমাত্র

তাহা নাহি জানে।
মানুষের ক্ষমতা সীমিত
পারে শুধু শুভেচ্ছা জানাতে অবিরত—
কায়মনোবাক্যে দেবতারে
স্মরণ করিয়া
তাঁর কৃপা লইতে মাগিয়া!
একমাত্র সর্বত্যাগী মহাজন যাঁরা
নিত্যসত্য ভগবানে করেছে আশ্রয়—
তাঁহাদের স্বার্থহীন আশীর্বাদ শুধু
পারে করিবারে ফলোদয়।
বিশ্বের কল্যাণ তরে আত্ম-পর-নির্বিচারে
তাঁহারা যে আশীর্বাদ করিবেন দান—
সেই আশীর্বাদ পারে দানিবারে ফল
সুমহান।
সংসারীরা স্নেহময় পুত্র-কন্যাদের
কল্যাণের লাগি
ভগবানে হয়ে অনুরাগী
তাঁর শ্রীচরণে একনিষ্ঠ মনে
প্রার্থনা জানাবে—
কৃপাময় ভগবান করুণা করিয়া
সে প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূরাবে।

সৃষ্টিধারা

জগৎ মাঝারে যত নদ-নদী
যত স্রোতস্বিনী—
অরণ্য প্রান্তর সর্ব বাধা অতিক্রমি
ধাইয়া চলেছে অবিরাম
একনিষ্ঠ মনে,

মিলিবারে বারিধির সনে!
অনুরূপ গতিময় জীবের জীবন—
জন্ম-জন্মান্তর বৃত্ত করি অতিক্রম
চলেছে ধাইয়া যুগ হতে যুগে
অবিরাম বেগে
মিলিবারে আপনার চৈতন্যস্বরূপে!
ইতর জনম অতিক্রমি বহু জনমের পরে
অতি ধীরে ধীরে লভিতে লভিতে
উচ্চ হতে উচ্চতর যোনি—
সর্বশেষ বার লভিছে সে
মানব আকার
চিন্তা করিবার শক্তি রয়েছে যাহার।
মানব রূপেতে জন্মি বহু বহু বার
অন্তরের চিন্তাশক্তি করি ব্যবহার
ক্রমে ক্রমে তার চেতনা জেগেছে—
আপনার স্বরূপ জানার।
এ মহান বিশ্বপ্রকৃতি আর যত প্রাণিগণ
কাহার সৃজন?
কোন সে চেতনা?
কেবা সেই মহাশক্তি?
কাহার ইচ্ছায় জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয়
এ ধরায়।
যুগ যুগ ধরি এই বিশ্ব-সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার
উন্মোচন করার সাধনা
করিতে করিতে অবশেষে,
স্রষ্টার স্বরূপ জেনেছে সে।
আরও জেনেছে সে—
জীবের কল্যাণে যুগে যুগে
গুরুরূপ ধরি
স্রষ্টা নিজে আসেন ধরায়
অবতরি,

তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবেরে
জানাইতে পথের সন্ধান,
দানিতে তাদের আত্মজ্ঞান।
প্রতি যুগে গুরুরূপী স্রষ্টা আসি
শিখান মানবে—
সংসার ত্যজিয়া সুকঠোর সাধনায়
নিমগ্ন হইয়া আপনার স্বরূপ
জানিতে—
বিশ্ব-আত্মার স্বরূপে আপনার স্বরূপ মিলাতে,
জীবনের উদ্দেশ্য লভিতে!
সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ স্রষ্টার স্বরূপ—
সে আনন্দে হইয়া মগন
লীলায় মাতিয়া যুগে যুগে
করিছেন তিনি বিশ্বের সৃজন।
সেই সৃষ্টি পুনঃ লীলা অবসানে
করেন চূর্ণন পুলকিত মনে।
অপরূপ এই ভাঙা-গড়া
স্রষ্টার খেয়াল—
অন্তহীন এই খেলা খেলিয়া চলেন তিনি
ধরি চিরকাল।

জয়রামবাটি

সুপবিত্র গ্রাম তুমি, জয়রামবাটি,
শ্রীমা সারদার পুণ্য জন্মভূমি,
ধন্য ধন্য তুমি—
নতশিরে ভক্তিভরে
তোমারে প্রণমি!

বাঙলার অতি ক্ষুদ্র অখ্যাত
অজ্ঞাত এক পল্লীভূমি—
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে
লভিয়াছ খ্যাতি
আজ তুমি!
জগৎ জননী সারদামণির ধাত্রীমাতা হয়ে
তব ক্রোড়ে সারদামণিরে জন্ম দিয়ে
সার্থক হয়েছ তুমি, আর
এ ভারতভূমি!
শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের অধিকাংশ
কেটেছে শ্রীমা'র তব ক্রোড়ে—
তব স্নেহাঞ্চল ত্যজি পারেনি
থাকিতে মাতা দীর্ঘদিন দূরে!
পিত্রালয় ছাড়ি যবে যেতে হত তাঁরে দক্ষিণেশ্বরে,
ভক্তিভরে প্রণাম জানাত শ্রীমা
তোমার ধূলিরে—
স্বর্গ হতে উচ্চতর জানি সে মাটিরে!
তব অঙ্কে প্রতিষ্ঠিতা "দেবী সিংহবাহিনী" মাতারে
জাগ্রতা জানিয়া, প্রণাম জানাত নিত্য
অতি ভক্তিভরে—
বিশ্বাস করিত মাতা একান্ত অন্তরে
তাঁর চরণতলের মাটি
সর্বরোগ হরে।
পবিত্র সে মাটি মাতা প্রতিদিন নিজে
করিত গ্রহণ—
প্রিয়তমা "রাধু"-রেও ভক্তি ভরে
কিছু কিছু করাত সেবন।
"দেবী সিংহবাহিনী"-র মহিমা প্রচার হল
সারদা-মা হতে—
দূর দূর দেশ হতে অগণিত লোক আসি
সেই মাটি সেবন করিত
রোগ নিবারিতে।

আজ মা সারদা তাঁর মরতনু ত্যজি
গেছেন চলিয়া নিত্যধামে—
পুত্রতুল্য তাঁর শিষ্যগণ
করেছে স্থাপন তাঁর জন্মস্থানে,
তোমার মাটিতে,
মর্মর বিগ্রহ তাঁর মন্দিরের তলে,
সেথা তাঁর নিত্যপূজা চলে!
স্বদেশ-বিদেশ হতে শত শত পুণ্যকামী ভক্ত
আজ আসে দলে দলে—
দর্শন স্পর্শন তরে
সারদা মায়ের জন্মভূমি,
তব পুণ্যভূমি।
তব ক্রোড়ে জন্ম দিয়া সারদামণিরে
সার্থক হয়েছ আজ তুমি!
ধন্য তুমি জয়রামবাটি,
স্পর্শমণি সারদামণিরে অঙ্কে ধরি
হয়ে গেছ তুমি স্বর্ণখনি!
যুক্ত করে বারে বারে
তোমারে প্রণমি!

বিন্দুবাসিনী

বিন্দুবাসিনী শ্রীসারদা মাতা,
তুমি জগৎ-বন্দিতা!
কৃচ্ছ্রতার প্রতিমূর্তিরূপে স্বামীসেবা তরে
ত্যাগমূর্তি তুমি—
দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষ কাটিয়েছ ন'বতের ঘরে
প্রসন্ন অন্তরে!

ন'বতের দোতলায়—
বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা ছিলেন যেথায়,
প্রাণপণ সেবা আর যত্ন করি তাঁরে
কেটেছে তোমার দিন
শ্রান্তি-ক্লান্তি-বিরামবিহীন!
লোকচক্ষু অন্তরালে সঙ্গোপনে ঢাকিয়া নিজেরে
ছিলে সেই অতি ক্ষুদ্র ন'বতের ঘরে—
স্বামী আর শাশুড়ি মায়েরে
সেবিবার তরে প্রাণপণ করে!
তব আত্মত্যাগ ব্রত তুলনারহিত—
আত্মীয় কি পর যাহারা দেখিত তোমা
বিস্ময় মানিত।
অতি ভোরে অন্ধকারে উঠি
গঙ্গাস্নান সারি—
ন'বতের ঘরে মাতা করিতে প্রবেশ—
দিনের কর্তব্য শেষে
সন্ধ্যার আঁধারে পুনঃ
বাহিরিয়া ফেলিতে নিঃশ্বাস!
স্বামী ও শাশুড়ি আর ভক্তশিষ্য তরে
সারাদিন ধরে অক্লান্ত শরীরে
রন্ধন করিতে তুমি যত্ন সহকারে।
তাঁহাদের তৃপ্ত করি নিজে তৃপ্তি পেতে—
কাটিত তোমার দিন
আনন্দেতে মেতে!
গৃহকর্ম অবসরে নিত্য-পূজাধ্যানে
কাটিত সময়—
বিশ্রাম করার কথা কভু
মনে তব হোত না উদয়!
"আনন্দের পূর্ণঘট" তোমার অন্তরে
ছিল প্রতিষ্ঠিত—
আত্ম-পর সকলেরে গ্রহণ করিতে, মাতা,
আপনার মতো!

কখনও নির্জন দ্বিপ্রহরে
ঠাকুর আসিয়া নিজে
পাঠাতেন তোমা ঘরের বাহিরে—
প্রতিবেশীদের ঘরে
বেড়াবার তরে।
ফিরিয়া আসিতে মাতা তুমি
পুনঃ সন্ধ্যার আঁধারে—
সকলের দৃষ্টি-অগোচরে!
মানবীরূপেতে মাতা এসেছিলে তুমি
এ জগতে—
আদর্শ-বিস্মৃতা কলি-নারীদের মাঝে
নারীর আদর্শ প্রচারিতে।
নারীর আদর্শ রূপ—
আত্মত্যাগ-ধৈর্য-সেবা-সন্তোষ
শিখাতে।
নারীর আদর্শ তুমি,
সারদা জননী,
তোমারে ধরিয়া অঙ্কে
ধন্য হোল এ ভারতভূমি!
নতশিরে ভক্তিভরে তোমারে প্রণমি!

শ্রীশ্রীবামদেব

বাঙলার বীরভূম শাক্ত আর
বৈষ্ণবের সাধনার স্থান—
মহাবিদ্যা তারাদেবী অষ্টশক্তিপীঠে
আছেন সেথায় বর্তমান!
ব্রহ্মার মানসপুত্র তারাসিদ্ধ বশিষ্ঠদেবের
প্রতিষ্ঠিত, শিলাময়ী তারা-মা প্রতীক—

আছেন
তারাপীঠে আজও জাগ্রত!
তারাপীঠ সন্নিকটে আট্‌লা গ্রামেতে
পূজক ব্রাহ্মণ সর্বানন্দের গৃহেতে
ফাল্‌গুনের শিবরাত্রি দিনে—
জন্মিলেন পুত্র বাম
জন্মান্তরীণ শুভ-সংস্কার লইয়া,
বয়সের পরিণতি সনে
উহা উঠে বিকশিয়া!
পিতার যাত্রার দলে বাম-রাম দু'ভাই তাঁহারা
গাহিতে গাহিতে গান
পুত্র বাম হত আত্মহারা—
কীর্তনের মাঝে বাম সংজ্ঞা হারাতেন,
ভাবের পুলকে তন্ময় হইয়া রহিতেন।
তারাপীঠে পরম সাধক কৈলাসপতিবাবা
সহসা দেখিয়া বামাচরণেরে—
চিনিলেন শক্তি-সাধকের শুভ-সংস্কার
রয়েছে তাঁহার অন্তরে!
পিতার মৃত্যুর পরে বামের উপরে
ন্যস্ত হয় সংসারের ভার—
কিন্তু সে দায়িত্ব পালনের শক্তি
কিংবা চেষ্টা দেখা গেল না তাহার!
তারা-মা'র মন্দিরেতে ধ্যানরত থাকি
দিব্যোন্মাদে আত্মহারা হয়ে—
"তারা-তারা" বলি চিৎকারিত,
মায়ের প্রসাদী অন্ন শ্মশান-কুক্কুর
সাথে একপাতে ভাগ করি খেত।
তারাপীঠ মহাশ্মশানের পাশে
খরস্রোতা দ্বারকানদীর পরপারে
সাধক কৈলাসপতিবাবার আশ্রম—
সে নদী সাঁতারে পার হয়ে
বাম নিল বাবার শরণ,
গুরু বলি কৈলাসপতিরে
করিল গ্রহণ।

পরম সাধক কৈলাসপতিবাবা
বামাচরণের জননীরে আশ্বস্ত করিয়া
ক্ষ্যাপা বামাচরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার
নিজ স্কন্ধে নিলেন তুলিয়া।
বহুবিধ রূপে বামে সাধন শিখাল—
সাধনের গুহ্যতত্ত্ব ক্রমে সব
বামেরে জানাল।
গুরুকৃপা লভি বাম "তারাসিদ্ধ" হল
অলৌকিক যত ক্ষমতার
পরিচয় দিল।
তারা-মা'র সিদ্ধপীঠে বসায়ে বামেরে
গুরু কৈলাসপতি সে পীঠ ত্যজিয়া
গেলেন চলিয়া দেশান্তরে।
দেশে দেশে বামের মহিমা প্রচারিত হল—
"তারাপীঠ-ভৈরব" বলিয়া
দেশবাসী তাঁহারে জানিল।
পরমকরুণাময় ক্ষ্যাপা বাম
তারা-মা'র শরণ নিলেন—
দেশবাসীদের দুঃখ-বিপদের
হাত হতে উদ্ধার করিতে
লাগিলেন।
অর্ধ-শতাব্দী কাল শক্তি-সাধনার পূত শিখাটিরে
অনির্বাণ রাখি—
অবশেষে শ্রাবণের এক গভীর নিশাতে
ভক্ত-শিষ্য-কুক্কুরাদি সকলেরে
শোকের সাগরে ভাসাইয়া
"তারা-তারা" রবে পীঠস্থান উচ্চকিয়া
সমাধিতে হইয়া আসীন,
পরম সাধক ক্ষ্যাপা
মহাসমাধির মাঝে হইলেন লীন!

পরমাপ্রকৃতি

পরমাপ্রকৃতি জগৎজননী তুমি
এসেছিলে নামি ধরার ধূলিতে—
ঘনঘোর কলির তিমিরে
আলোকবর্তিকা লয়ে
পতিত-দুর্গত জনগণে
পথ প্রদর্শিতে!
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি তুমি
এসেছিলে নামি তাঁর লীলার সঙ্গিনী হয়ে,
উভয়ের মিলিত চেষ্টায়
অধর্মের বিনাশ সাধিয়া
ধর্ম প্রতিষ্ঠায়!
অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে
আদর্শ-বিচ্যুতা নারীগণে
নারীর সার্থক রূপ প্রদর্শিয়া
আপন জীবনে—
নারীর আদর্শ সংস্থাপনে!
কন্যা-জায়া-ভগিনী-জননী আর
গুরুরূপে সুদীর্ঘ জীবনখানি তব
রচনা করেছে জগৎবাসীর তরে
এক মহাগ্রন্থ অভিনব।
শৈশবে পিতার গৃহে নীরব সাধনা মাঝে
কেটেছে তোমার দিনগুলি—
স্নেহময় পিতামাতা আর
শিশু ভ্রাতাদের অক্লান্ত সেবাতে
আপনারে ভুলি!
বিবাহের পরে ধীরে ধীরে যবে
কৈশোর লভিলে—
স্বামী-সেবা তরে
পিতৃগহ ছাড়িয়া আসিলে।
পতি তোমা গুরুরূপে অতীব যতনে
দিলেন সমাজ-শিক্ষা আর তার সনে

চিনালেন তোমা নিত্যসত্য ভগবানে—
যিনি এই অনিত্য সংসারে
মানবের পরম আশ্রয়,
তিনি ছাড়া আর কেহ আপনার নয়!
স্বামীর সংসারে দক্ষিণেশ্বরে
যবে তব হল আগমন—
ষোড়শী জননীরূপে পূজিয়া তোমারে
মাতা চন্দ্রাদেবী আর জগৎজননী
ভবতারিণীর সনে অভিন্ন জানিয়া,
মাতৃ-জ্ঞানে পতি তোমা
করেন গ্রহণ!
পতির সেবার তরে সেথা কাটাইলে তুমি
সুদীর্ঘ বৎসরগুলি ন'বতের অতি ক্ষুদ্র ঘরে—
লজ্জাশীলা বধূরূপে
সকলের দৃষ্টি-অগোচরে।
সীমাহীন ত্যাগ-সেবা-সহিষ্ণুতা আর
সন্তোষের মাঝে কেটেছে তোমার দিনগুলি
আনন্দেতে মেতে—
অন্য কোনও নারী যাহা
পারিত না কখনও সহিতে!
গুরুরূপ-পতি ক্রমে তোমার নিকটে
পাঠালেন তাঁর বাল-শিষ্যগণে একে একে—
তব মাতৃ-স্বরূপের বিকাশ সাধিতে
সেই নহবতে!
গ্রহণ করিলে তুমি সেই শিষ্যগণে
আপন সন্তান জ্ঞানে আনন্দিত মনে—
তাহাদের মাতৃ-সম্বোধন
পরিতৃপ্ত করেছিল তব প্রাণ-মন!
মরতনু ত্যজিবার পরে
সূক্ষ্মদেহে দেখা দিয়া পতি কহেন তোমারে—
শিষ্যগণে একে একে মন্ত্রদান তরে।

পুনঃপুন পতির আদেশে—
মন্ত্রদীক্ষা দিতে শিষ্যগণে
আরম্ভিলা তুমি অবশেষে!
তোমার মাঝারে "গুরুশক্তি" উদ্বোধন করিবার পরে—
পতির ইচ্ছারে পূর্ণতা দানিতে
সুদীর্ঘ বৎসরগুলি দেশ-বিদেশের
শত শত পতিত দুর্গত জনগণে,
উদ্ধারিলে তুমি, মাতা, পতিতপাবনী,
মন্ত্রদীক্ষা দানে!
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পাপী-তাপী-অধমেরে
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া—
তাহাদের পাপভার গ্রহণ করিয়া
স্বীয় লীলাতনু নিঃশেষিলে তিলে তিলে,
দুঃসহ দেহের ক্লেশ ভুগি
অবশেষে মরদেহ তেয়াগিয়া গেলে।
হে জননী, তোমার জীবনখানি
রাখিয়া গিয়াছ তুমি বিশ্বময় যত
নারীদের তরে—
তোমার মাঝারে হেরি আদর্শ নারীর রূপ
যেন তারা শিখিবারে পারে।
ধৈর্য-সহ্য-ক্ষমা আর সন্তোষাদি যত
নারীর মহৎ গুণ জগতে বিদিত—
সে সকল দেখাইয়া আপন জীবনে
দানিলে অপূর্ব শিক্ষা বিশ্ব-নারীগণে!
তোমার জীবনরূপ "মহাগ্রন্থ"-খানি পাঠ করি—
স্বদেশী-বিদেশী শত শত নারী
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে লভিয়াছে, লভিতেছে
আজও তোমার শরণ,
জীবনের যথার্থ স্বরূপ লভি
সার্থক করিতে আপন জীবন!

কবি

আপন আনন্দে মাতি আপনার মনে
হৃদয়ের সহস্র প্রকার অনুভূতি
যাহা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
প্রকাশ করেন যিনি
ছন্দোবদ্ধ ভাষার মাধ্যমে—
তাঁহারে সকলে কবি বলি জানে!
চেষ্টা করি কাব্য কভু লেখা নাহি যায়—
কবির অন্তর হতে স্বতঃস্ফূর্তরূপে
কবিতার স্রোত বাহিরায়।
ভাবের পুলকে মাতি রহে কবি-মন
আপনি আপনা মাঝে
থাকে সর্বক্ষণ—
বাহির বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ
করি আহরণ,
রচেন সেথায় তাঁর "ধ্যানলোক"
মনের মতন!
সেই ধ্যানলোক হতে আসে নামি কাব্যস্রোত
কবির অন্তরে—
যাহা প্রকাশিত হয় তাঁর লেখনীতে
বিচিত্র প্রকারে!
জগৎ ও জীবনের সত্যরূপ যাহা
তাঁর রচনার মাঝে স্থান পায় তাহা।
অন্যায় অসত্য কভু প্রবেশ না পায়
তাঁর কবিতায়।
নিত্যসত্য ভগবানে অনুরাগী মনে,
তাঁর সৃষ্ট মহাবিশ্ব আকাশ মেদিনী
আর যত জীবগণে
অভিন্ন জানেন তিনি
আপনার সনে।

কবির কবিতা মাঝে তাই
সত্য-শিব-সুন্দরের অপূর্ব প্রকাশ
দেখিবারে পাই—
যিনি রয়েছেন তাঁর হৃদয়-গহনে
কৃপাদানে সার্থক করিতে
কবির জীবনে!

কলিতীর্থ কাশীপুর

যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের
অন্ত্যলীলা-ক্ষেত্র কাশীপুর
মহানগরীর প্রান্ত হতে
নহে বেশি দূর!
কাশীপুর উদ্যান-ভবন আর
ভাগীরথী তীরে কাশীপুরের শ্মশান—
কলির মহান তীর্থরূপে
আছে বিদ্যমান।
নগরীর কোলাহল হতে দূরে
সুউচ্চ প্রাচীর-ঘেরা নির্জন উদ্যানে—
দ্বিতলের গৃহে সযতনে রেখেছিল
রোগাক্রান্ত গুরুদেবে চিকিৎসার তরে
তাঁর প্রিয় শিষ্যগণে!
গুরুদেবে সেবিবার তরে প্রাণপণে,
তাঁর একান্ত আপন যুব-শিষ্যগণে
ত্যজিয়া সংসার ক্রমে ক্রমে
একত্রিত হল কাশীপুর
উদ্যান-ভবনে।
শ্রীগুরুর মঙ্গল ইচ্ছায়
প্রাণঘাতী রোগের কারণে,

প্রিয় শিষ্যগণে আবদ্ধ হইল
পরস্পর প্রেমের বন্ধনে!
লীলাতনু ত্যজিবার আগে
গুরুদেব তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যে ডাকি
সংগোপনে আপনার স্বরূপ জানাল—
তাঁর মাঝে আপনার শক্তি সঞ্চারিয়া
ত্যাগী শিষ্যদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার
তাঁহার উপরে সমর্পিল।
এইকালে অসুস্থ দেহেতে সহসা একদা
গুরুদেব রোগশয্যা ত্যজি
আসেন নামিয়া উদ্যানের মাঝে
তাঁহার দর্শনে গিরিশাদি গৃহীভক্তগণ
একে একে করিতে লাগিল
তাঁর চরণ-বন্দন!
শ্রীগুরু তখন কহিলেন তাঁহাদের
"চৈতন্য হোক" এই আশিস বচন—
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ভক্তগণ নিমেষ মাঝারে
আপন অন্তরে লভিলেন
আপন আপন অভীষ্ট দর্শন!
কী আশ্চর্য উহা না যায় চিন্তন!
সেই ক্ষণ হতে এই পুণ্যদিন
"কল্পতরু দিবস" বলিয়া
প্রচারিত হল—
শ্রীরামকৃষ্ণেরে জগৎবাসীরা
"কল্পতরু" বলিয়া চিনিল।
কাশীপুর উদ্যানের ধারে ভাগীরথী তীরে
যেই শ্মশান রয়েছে—
শ্রীরামকৃষ্ণের পূত লীলাতনু সেথা
শেষ পরিণতি লভিয়াছে।
সেই কাল হতে কাশীপুর উদ্যান ও
সে শ্মশানভূমি—
মহাতীর্থরূপে পরিচিত হল,
যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা

আর অন্তিম শয়ানক্ষেত্র বলি
সকলে জানিল।
দেশ-দেশান্তর হতে শত শত ভক্তশিষ্য
আসেন আজিও
পবিত্র এ কল্পতরু দিনে—
বিনম্র ভক্তির অর্ঘ্য
নিবেদিতে শ্রীগুরু-চরণে।

পুণ্যভূমি ভারত

হে ভারতভূমি, অধ্যাত্ম-জীবন আর
সাধনার লীলাক্ষেত্র তুমি,
তোমারে প্রণমি!
যুগ যুগ ধরি অধ্যাত্ম চেতনা আর
অধ্যাত্ম শক্তির এক সংহত ভাণ্ডার রূপে
রহিয়াছ তুমি—
তোমার তুলনা নাহি জানি!
তোমার সন্তানগণ নিরত রয়েছে অবিরত
করিবারে উপলব্ধি সেই মহান জীবন—
সার্থক করিতে মানব জনম!
ত্রেতা আর দ্বাপর-কলিতে নারায়ণ
নররূপে নামি দূর করি যত ধর্মগ্লানি
পবিত্র করেছে বার বার
এই মহাতীর্থভূমি—
আজিও যাহার বিরাম হয়নি।
ধ্যানমৌন ধূর্জটি সমান
তব পিতা হিমাদ্রি সতত
রহিয়াছে পাহারায় রত—
নিম্নে সিন্ধু জননীর প্রায়
স্নেহাঞ্চল দিয়া রাখিয়াছে
সযতনে তোমারে ঘিরিয়া!

বহির্বিশ্বের সহস্র সংঘাত
পারেনি তোমারে বিনাশিতে—
সব জাতি সব ধর্ম সব ভাষাভাষী
তোমার মাঝারে আসি
লভেছে বিরাম শান্ত চিতে!
অধ্যাত্ম-সাধন শীর্ষে থাকি
শিখাইছ বারে বারে বিক্ষুব্ধ জগতে—
সে-মহান উপলব্ধি
আপনার অন্তরে লভিতে!
শুধুমাত্র বহির্শক্তির সাধনাতে
মানব-জীবন কভু পারিবে না
পরিতৃপ্ত হতে।
লোভ-লালসার বশে পরের সাম্রাজ্য
গ্রাস তরে উন্মত্ত হইয়া—
অবিরত পরস্পরে হানাহানি করি
উভয়েরই বিনাশ ঘটিবে।
হে ভারত, শিখাইছ তুমি জগতেরে
আপনার মাঝে সুপ্ত অধ্যাত্ম-চেতনা
বিকশিত করি
আপন জীবন সার্থক করিতে—
অন্তর হইতে লোভ-হিংসা-দ্বেষ আদি
আসুরিক প্রবৃত্তির বিনাশ সাধিয়া
জগতেরে ধীরেধীরে
উন্নীত করিতে!
সারাবিশ্বে এ মহান আদর্শ স্থাপনে
সচেষ্ট রয়েছ তুমি চিরদিন—
বিধাতার কল্যাণ ইচ্ছায়
তোমার এ শুভ চেষ্টা
সফল হইবে একদিন!

কামারপুকুর

যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মভূমি
আর বাল্যলীলাভূমি
কামারপুকুর নামে বাঁকুড়া জিলার
অখ্যাত দরিদ্র গ্রামখানি—
শতবর্ষ পরে আজ তারে
বিশ্বের মহান তীর্থ বলি জানি!
দেশ-দেশান্তর হতে অগণিত ভক্তশিষ্য আসে
শুধু স্পর্শ লভিবারে সেই সুপবিত্র ধূলি—
যে-ধূলিতে মিশি রহিয়াছে আজও
সেই অতীতের দেব-মানবের
পূতচরণ-পরশে ধন্য
ধূলিকণাগুলি!
শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত
এক পবিত্র মন্দিরে—
শ্বেত-মর্মর বিগ্রহে রহিয়া আসীন
দানিছেন কৃপা তিনি ভক্তগণে
সারা নিশিদিন!
তাঁর শুভ জন্মদিনে শত শত ভক্ত আসি
মিলেন এ পুণ্যতীর্থ কামারপুকুরে—
দর্শন-স্পর্শন করি এ মাটিরে
তাঁর কৃপা লভিবারে,
সার্থক করিতে জীবনেরে!
কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে প্রবেশের মুখে
যুগীদের শিবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে—
যে-শিবের অনুপম জ্যোতির পরশে
মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরে
লভিয়াছে!
তাঁর ভিক্ষামাতা ধনী কামারনী-গৃহখানি
আজ এক দর্শনীয় পবিত্র মন্দির
বলি মানি।

লাহাবাবুদের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ঘর
বহন করিছে আজও তাঁর বাল্য পাঠ-স্মৃতি
পবিত্র সুন্দর।
দেবী বিশালাক্ষী পীঠস্থানে যাইতে যাইতে
পথিমধ্যে আনুড় গ্রামেতে
অপরূপ এক দিব্যজ্যোতির দর্শনে
প্রথম সমাধি লাভ হয়েছিল তাঁর—
পবিত্র সে গ্রামখানি নহে ভুলিবার!
ধন্য মানি পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে—
যুগদেব শ্রীরামকৃষ্ণেরে অঙ্কে ধরে
সার্থক হয়েছে তাহার জনম
আর কৃতার্থ হয়েছে সেই সাথে
বিশ্ববাসিগণ!

দক্ষিণেশ্বর

কলিকাতা মহানগরী হইতে বহু দূরে
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে
সুপবিত্র গ্রাম দক্ষিণেশ্বর—
নরনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের
লীলাভূমিরূপে রহিয়াছে
চির ভাস্বর!
পুণ্যবতী রানী রাসমণি
জগৎজননী দেবী ভবানীর স্বপ্নাদেশ লভি
প্রতিষ্ঠা করেন শিলাময়ী দেবী ভবতারিণীরে
এক পবিত্র মন্দিরে এই দক্ষিণেশ্বরে
পুণ্য স্নানযাত্রা দিবসেতে
মহাসমারোহ করে!

দেবীর পূজার ভার অর্পিলেন
নিষ্ঠাবান শ্রীরামকুমারে—
তাঁর সহোদর গদাধর আসিলেন সাথে
অগ্রজের সাহায্যের তরে।
জগৎ ঈশ্বরী ভবানী জননী
আপনার অপরূপ লীলা প্রকাশিতে
বিচিত্র এ আয়োজন করিলেন ধীরে
নব প্রতিষ্ঠিত এই দেবীর মন্দিরে
দক্ষিণেশ্বরে!
কিছুকাল পরে পূজক শ্রীরামকুমারের
দেহত্যাগ হলে—
মন্দিরের নিত্যপূজা ভার অর্পিত হইল
গদাধরের উপরে, ভাগিনেয়
হৃদয়রামেরে আনিলেন সেথা
পূজাকালে সাহায্যের তরে।
এইকালে গদাধর আপনা ভুলিয়া
নিরত রহেন সাধনায়—
খ্রিস্ট-আল্লা-পরব্রহ্ম আদি
সকল ধর্মের সাধনায় গুরুর সহায়ে
সিদ্ধি লভি ক্রমে
হইলেন পরিচিত
"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নামে!
মহানগরীর ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীকেশব সেন,
ভক্তবীর বসু বলরাম, কেদার, বিজয়,
রাম দত্ত, সুরেশ, গিরিশ আদি গৃহীভক্তগণ
একে একে উপনীত হইলেন দক্ষিণেশ্বরে
হেরিবারে এই সদানন্দময়
পুরুষপ্রবরে!
যাঁর যাহা ধর্মীয় জিজ্ঞাসা
তার সহজ সুন্দর মীমাংসা লভিয়া—
যান ফিরি সকলে তাঁহারা
সন্তুষ্ট হইয়া।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে যুবক ও ছাত্রদল
লাগিল আসিতে এই দক্ষিণেশ্বরে—
হেরিবারে এই দিব্য পুরুষেরে আর
তাঁর দিব্য-উপদেশ লভিবারে।
কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে আসিতেন মহানগরীতে—
গৃহীভক্তদের বাড়ি গিয়া অপূর্ব সংগীত
আর দিব্যবাণী শুনাইতে!
শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে দুরারোগ্য ব্যাধির সঞ্চারে—
ভীত যুবভক্তগণ সেবা আর সুচিকিৎসা তরে
লইয়া গেলেন তাঁরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হতে
কলিকাতা মহানগরীতে।
শ্রীরামকৃষ্ণের সুপবিত্র লীলাস্থলী
এই গ্রাম দক্ষিণেশ্বর—
মহাতীর্থরূপে খ্যাত হইয়াছে আজ
জগৎ ভিতর।
জগতের সকল দেশের ভক্তগণ
আসেন হেথায় করিতে দর্শন
তাঁর সাধনার স্থান পবিত্র সুন্দর—
বিল্বতল, পঞ্চবটী মূল, দেবী ভবতারিণী
মন্দির আর সেই গৃহখানি
যেথায় দেখিত ভক্তগণ মুহুর্মুহু তাঁরে
নির্বিকল্প সমাধি মাঝারে
বিস্মিত অন্তরে!
ধন্য মানি এই গ্রাম দক্ষিণেশ্বরে—
যেই গ্রামখানি বহন করিছে আজও
শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতি
আপনার হৃদয় মাঝারে।

পতিতোদ্ধারিণী

জগৎজননী, পতিতোদ্ধারিণী মাতা তুমি,
সংসার-গহন-কূপে পড়িয়া রয়েছি
মোরা জন্ম-জন্মান্তর ধরি
আপনার স্বরূপ বিস্মরি—
উদ্ধারের পথ নাহি জানি।
তোমার সন্তান মোরা, তব অংশে মোদের জনম—
নিশ্চিন্ত আশ্রয় তব ক্রোড় ত্যজিয়া এখন
বাসনার বশে মায়াময় এ সংসারে এসে
সংসারের এই কূপটিরে শুধুমাত্র চিনি
ইহারেই একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয়
বলি জানি।
জীবনের যতবিধ শান্তি-সুখ-আনন্দের খোঁজে
এই অন্ধকূপের মাঝারে বৃথা ভ্রমি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরি অবশেষে
মরু-মরীচিকাপ্রায় সুখ আর
আনন্দের দিনগুলি নিমেষে ফুরায়-
দুঃখ-দৈন্য-জরা ও মরণ দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার রূপে
ঘিরি রহে মোদের জীবন!
জীবন ভরিয়া ক্রমাগত দুঃখ আর আঘাত সহিয়া
জীবনের প্রতি যবে বিতৃষ্ণা জন্মায়—
সেইক্ষণে, হে জননী, তোমার করুণাধারা
নিদাঘের ক্ষরা শেষে বরষার প্রায়
তৃষিতের অন্তর জুড়ায়!
মা তুমি তখন গুরুমূর্তি ধরি কাতর সন্তানে
দিয়া দরশন হাত ধরি তোল যে টানিয়া
সংসারের অন্ধকূপ হতে—
দানিতে আশ্রয় তব ক্রোড়ে,
পরম নিশ্চিন্ত সেই নীড়ে!
জননীগো, তুমি যুগে যুগে বারবার
বিগলিত করুণায় এসেছ নামিয়া এ ধরায়—

উদ্ধারিতে যত পতিত দুর্গত তোমার সন্তানে,
সংসারের অন্ধকূপ হতে নিয়ে যেতে
জ্যোতির্ময় আলোক অঙ্গনে!
তাই মোরা জানি—
তুমি আমাদের একান্ত আপন
ব্রহ্মহৃদি-বিলাসিনী মাতা
পতিতোদ্ধারিণী!

যশোমতী মাতা

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সুদীর্ঘ
ত্রিংশ বর্ষব্যাপী জীবনকালের ঘটনা অবলম্বনে
স্মৃতিগাঁথা নামক জীবন-ইতিহাস রচয়িত্রী
শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তীর উদ্দেশে রচিত।)

দ্বাপরের যশোমতী মাতা,
তুমি জগৎ-বন্দিতা!
শিশু গোপালেরে অনুপম স্নেহে
লালন করিয়াছিলে চতুর্দশ বর্ষ ধরি
আপনার গেহে, মাতা তুমি,
মূর্তিমতী বাৎসল্যরূপিণী!
এ ঘোর কলিতে পুনঃ হেরিলাম
অপার বিস্ময়ে—
এসেছ নামিয়া তুমি ধরার ধূলিতে
নবরূপে নবনামে নবভাবে
নব পরিবেশে,
বালক গোপাল-বোধে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরে
পুত্রস্নেহে লালন করিতে!
মহানগরীর দক্ষিণ-প্রান্তেতে আপন ভবনে
মহারাজবাবা-বেশী নন্দরাজাসনে
ছিলে তুমি, মাতা, অতি সংগোপনে—

চিনিতে পারেনি সাধারণে
ছদ্মবেশী তোমা দুইজনে!
সুদীর্ঘ সময় ত্রিংশ বর্ষ কাল
পুত্রস্নেহে পরম যতনে অভিনব এই গোপালেরে
লালন করিয়াছিলে তোমরা দু'জনা
অপার নিষ্ঠায়, ভুলিয়া আপনা!
সতত তোমার গৃহে ভক্ত জনগণ
আসিতেন করিতে শ্রবণ
তোমার গোপাল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের
শ্রীমুখ হইতে অনুপম তত্ত্ব-নির্ঝরণ!
তব গৃহে দ্বিতলের গোল-বারান্দাতে
এই অনুপম দিব্য-আলোচনাকালে
কখনও হেরিত ভক্তগণ
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরে
আত্ম-নিমগণ অপরূপ সমাধি মাঝারে,
নৃত্যরত কখনও বা দু'বাহু তুলিয়া
মা-মা স্বরে!
আবার কখনও মুহুর্মুহু কম্পিত ও রোমাঞ্চিত
হত তাঁর দেহ ভাবের পুলকে—
কখনও লুণ্ঠিত হয়ে পড়িতেন তিনি
ভূমিতলে কীর্তনের কালে!
এ-হেন অপূর্ব আত্মহারা শিশু-প্রায়
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরে রাত্রিদিন প্রহরীর মত
সতর্ক থাকিয়া সময় বুঝিয়া
স্নানাহার করাইতে তোমরা দু'জনে—
কত যে কঠিন কাজ
ভাবিতে পারে না সাধারণে!
বিশ্বজননীর শ্রীমুখের "সানাই" যে-মত
তাঁর শ্রীমুখ হইতে অবিরত
নির্গত হইত নব নব তত্ত্বগীতি আর
তত্ত্ববাণী—
সে সকল অনুপম দিব্যবাণী আর

সংগীতেরে লিখিয়া রাখিতে, মাতা তুমি,
যত্ন সহকারে, আপনার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে।
তোমাদের সাথে তাঁর ত্রিংশ বর্ষব্যাপী
জীবনলীলার "স্মৃতিগাঁথা" নামে
তুমি গাঁথিয়াছ হার—
তাহার মাঝারে ভক্তগণ অসীম পুলকে
লভিছে দর্শন অনুপম সেই
শিশু-ভোলানাথের জীবন!
সযত্ন-রক্ষিত তব সংগ্রহ-ভাণ্ডার হতে আজ
তাঁর যত কথা যত বাণী যত গান—
সে সকলে করিয়া চয়ন তাঁর ভক্তগণ
পুস্তক আকারে প্রচার করিতে রত রহিয়াছে
অনুরাগভরে সর্বক্ষণ!
দীর্ঘকাল করিয়া বহন তব গোপালের
সুকঠিন সেবাভার—
মহারাজবাবা গেলেন ত্যজিয়া
মর্ত্যতনু তাঁর!
যশোদা জননী, তব প্রাণের গোপাল,
কালপূর্ণ জানি, মাগিল বিদায়
তোমা হতে—
ভাসাইয়া তোমা অশ্রুর-বন্যাতে!
নররূপী নারায়ণ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর
তব গৃহাঙ্গন হতে দাঁড়ালেন আসি
বহির্বিশ্বেতে—
জগৎজনের অন্তর হইতে
অন্যায়-অধর্মরূপী অসুরের বিনাশ সাধিয়া
ন্যায় আর ধর্ম প্রতিষ্ঠিতে!
এ ঘোর কলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি
বিশ্বজগতের পাপভার বিদূরিত করি
সত্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিতে।
সে মহান কর্তব্য সাধিতে রত হইলেন
তিনি এবে—ধীর স্থির সমাহিত
শ্রীগুরুর ভাবে!

জীবন ভরিয়া আপনারে তিলে তিলে
নিঃশেষে দানিয়া সেবার মাঝারে,
মাতা, তুমি রহিয়াছ আজ
যশোদা জননী রূপে অমর হইয়া
বিশ্বজনের অন্তরে!

শ্রীবলরাম মন্দির

দাস্যভক্তি-প্রতিমূর্তি বসু বলরাম
মহানগরীর প্রান্তে তাহার ভবনে
আনিতেন আমন্ত্রণ করিয়া সতত
যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণেরে
পরম যতনে!
গৃহদেব মহাপ্রভু জগন্নাথের
সুপবিত্র প্রসাদান্নে
পরিতৃপ্ত করিতেন তাঁরে
আনন্দিত মনে।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন এ বাটীরে
তাঁর "দ্বিতীয় কেল্লা" এই নামে!
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হতে যবে আসিতেন তিনি
তাঁর এই দ্বিতীয় কেল্লাতে—
ধন্য করিতেন প্রিয়ভক্ত বলরামে
গ্রহণ করিয়া তাঁর সেবা
পুলকিত চিতে!
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় বালভক্তগণে
ডাকাইয়া আনিতেন একে একে
ভক্ত বলরাম আপন ভবনে-
শ্রীপ্রভুর আনন্দ-বর্ধনে,

"আনন্দের" হাট বসি যেত
তাঁর গৃহে এই দিব্যপুরুষের
আগমনে।
ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে সেই সকল ভক্তগণে
কখনও বা ভোজনের তরে আনিতেন
আমন্ত্রণ করি—
পরম নিষ্ঠায় সেবা করি তৃপ্ত করিতেন
সশিষ্য ঠাকুরে দাস্যমূর্তি ধরি!
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন-সংবাদ পাইলে
গৃহীভক্তগণ ক্রমে ক্রমে একত্রিত
হইতেন এ বসু ভবনে—
সংগীত-নর্তন আর কীর্তনের ধুম
পড়ি যেত তাঁর আগমনে।
পুণ্য রথযাত্রা দিবসেতে গৃহদেব প্রভু জগন্নাথে
পূজিতেন ভক্ত বলরাম পরম নিষ্ঠায়—
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে আনিতেন পূর্বদিনে
আমন্ত্রণ করি সে পূজায়!
অপরাহ্ণে ক্ষুদ্র এক রথে প্রভু জগন্নাথে
বলদেব আর ভগ্নী সুভদ্রার সনে
নববস্ত্রে পুষ্পে-পত্রে সুসজ্জিত করি
সযতনে দ্বিতলের বারান্দায়
রাখিতেন আনি—
পুলকিত শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে টানি রথখানি
মুহুর্মুহু তুলিতেন জয়-জয় ধ্বনি,
বধূগণ সঙ্গে সঙ্গে দিত হুলুধ্বনি।
অবশেষে ভাবের আবেগে রথের সম্মুখে
করিতেন নর্তন-কীর্তন ভক্তগণ সাথে—
শুনি সেই উচ্চ-সংকীর্তন পথচারিগণ
বিমুগ্ধ অন্তরে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে
দাঁড়াতেন পথে।
কখনও বা শ্রীমা সারদারে অতি যত্ন করে
আনিতেন প্রিয় বলরাম আপনার ঘরে—

সেবিতেন তাঁরে পতি-পত্নী উভয়ে মিলিয়া
একান্ত অন্তরে!
আপনার পুত্র আর পুত্রবধূ-বোধে সারদা জননী
গ্রহণ করেন তাঁহাদের পরম আদরে—
উভয়ের সেবা-যত্ন গ্রহণ করিয়া
তৃপ্ত করিতেন তাঁহাদের
অতি স্নেহভরে!
শ্রীরামকৃষ্ণের মরলীলা অবসানে
শোকাতুরা সারদা মায়েরে পুত্র বলরাম
আনিলেন আপন ভবনে—
পাঠাইয়া দিলেন তাঁহারে
নিজ পরিবার আর শ্রীমার সঙ্গিনীগণ সনে
শ্রীবৃন্দাবনে বৎসর কালের তরে
শোক নিবারণে।
সেবামূর্তি ভক্ত বলরাম শ্রীমার সাক্ষাতে
মরতনু ত্যজি গেলেন চলিয়া নিত্যধামে—
মিলিবারে তাঁর পরম আশ্রয়
শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে!
শতবর্ষ পরে আজ শ্রীবলরামের সেই পুণ্যধাম—
যুগদেবতার পূতলীলা-স্মৃতি বহন করিয়া
লভিয়াছে "শ্রীবলরাম-মন্দির" নাম।
দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্ত-জনগণ
আসেন সতত করিতে দর্শন—
দেবমানবের স্মৃতি-বিজড়িত
কলির পবিত্র তীর্থ
এই মন্দির-ভবন!

শ্রীশ্রী মায়ের বাড়ি

মহানগরীর উত্তর সীমায়
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পূর্ব কিনারায়
মাতৃভক্ত সারদানন্দ স্বামী
নির্মাণ করেন উদ্বোধন-অফিস ভবন
সুদীর্ঘ দিনের অক্লান্ত চেষ্টায়।
উহার দ্বিতলে আনিলেন তিনি শ্রীমা সারদারে—
জয়রামবাটী গ্রাম হতে
তাঁর অনুগত সঙ্গিনী ও আশ্রিত আত্মীয়গণসহ
স্থায়ীভাবে আমরণ বসবাস তরে!
সেই বাটীখানি চিহ্নিত হয়েছে
তাঁর অন্ত্যলীলা-ক্ষেত্ররূপে—
ভক্তশিষ্যগণের নিকটে!
লীলাতনু ত্যজিবার আগে
কালব্যধি ভুগিয়াছিলেন শ্রীমা
দীর্ঘদিন ধরে—এই গৃহের ভিতরে!
প্রথম প্রবেশ করি এ নব ভবনে
শ্রীমা নিজ হাতে করেন স্থাপন
শ্রীরামকৃষ্ণের পট অতীব যতনে—
আরম্ভেন নিত্যপূজা আর সেবা
একনিষ্ঠ মনে!
সেই পূজা আজও চলিতেছে সেই গৃহে
ভক্তশিষ্য পরম্পরা ক্রমে।
পূজার প্রসাদ বাঁটি দিতেন জননী
আপনার হাতে—
প্রসাদ না-লয়ে কেহ ফিরিত না
মা'র বাটী হতে।
ভক্তজন কিংবা সাধারণ
সকলের তরে ছিল একই নিয়ম!
আজিও সকলে মা'র বাটী হতে
প্রসাদ লইয়া ফিরে আনন্দিত চিতে—

মায়ের স্মরণে অনাবিল আনন্দের স্রোত
বহে হৃদয়-গহনে।
জগৎ জননী পরমা প্রকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের
লীলাসহচরী নারীরূপ ধরি
এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়াছিলেন
এই মর্ত্যভূমে—
স্নেহ-দয়া-ধৈর্য-সহ্য আর কৃচ্ছ্রতার
প্রতিমূর্তিরূপে, আদর্শ-নারীর রূপ
প্রচার করিতে!
শতবর্ষ পরে আজ শ্রীমা সারদার পুণ্যস্মৃতি
বিজড়িত মহাতীর্থ-সম এ ভবনখানি—
স্বদেশ-বিদেশ হতে অগণিত
ভক্তগণে আনিতেছে টানি।
জননীর শ্রীচরণরেণু মিশিয়া রয়েছে এ গৃহের
প্রতি ধূলিকণা সনে—
তাঁর শ্রীমুখের বাণী রণিত হইছে মৃদুস্বরে
গৃহ-অভ্যন্তরে—
স্থির চিত্তে শান্ত মনে বসি
ভক্তগণ শোনে কান পাতি
সে রণন।
অন্তিম শয্যায় শ্রীমা শায়িত যখন
ভক্তিমতী অন্নপূর্ণার মায়েরে
শান্তির মহান বাণী শোনালেন তিনি
অতি মৃদুস্বরে—
"যদি শান্তি পেতে চাও
পরদোষ না-দেখিয়া দেখ আগে
দোষ আপনার—
জগতে কেহই নহে পর
জগৎ তোমার!"

বেলুড় মঠ

নর-নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যতনু যবে
ভস্মীভূত হল কাশীপুর শ্মশানভূমিতে—
তাঁর পূত ভস্মরাশি লয়ে মতবিরোধের
সূচনা হইল সন্ন্যাসী-সন্তান আর
গৃহী-সন্তানেতে।
শুনি সে কাহিনী কহিলেন ক্ষোভে-দুঃখে
শোকাতুরা সারদা জননী—
"সোনার মানুষ" গেল চলি,
ভস্ম লয়ে এবে সবে করে দলাদলি!
অবশেষে ভস্মরাশি দু'ভাগ হইল—
গৃহী আর সন্ন্যাসী সন্তানগণে
ভাগ করি নিল!
গৃহীভক্তগণ শ্রীরাম দত্তের কাঁকুরগাছির
উদ্যান-ভবনে সেই ভস্মরাশি সযতনে
করিয়া প্রোথিত—
সুপবিত্র স্মৃতির মন্দির এক
করেন স্থাপিত।
"যোগোদ্যান" নামে সে-মন্দির পরিচিত হল—
নিত্যপূজা মহোৎসব মাঝে গুরুদেব
শ্রীরামকৃষ্ণেরে ভক্তগণ ঢালি প্রাণমন
সেবিতে লাগিল।
সন্ন্যাসী সন্তানগণ গঙ্গার পশ্চিম তীরে
বেলুড় গ্রামেতে জমি ক্রয় করি—
নির্মাণ করেন মঠ-বাড়ি
অতি মনোহারী।
সে মঠের অভ্যন্তরে শ্রীগুরুর দেহ-ভস্ম
প্রোথিত করিয়া—
বসবাস করিতে থাকেন সেথা
আশ্রম রচিয়া!

সংসার ত্যজিয়া একে একে সবে
আসেন সেথায়—
রহেন নিরত প্রাণ ঢালি
শ্রীগুরু সেবায়!
ক্রমে সেথা "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" প্রচলিত হল—
ধীরে ধীরে শিক্ষা তরে বিদ্যালয় যত
স্থাপিত হইল।
স্বদেশ-বিদেশ হতে অগণিত
ভক্তশিষ্যগণ—
অধ্যাত্ম-শিক্ষার তরে করিতে লাগিল
সেথা নিত্য আগমন।
বহির্বিশ্বেতে সনাতন ধর্ম প্রচারিতে
গেলেন চলিয়া প্রিয়শিষ্য তাঁর
দেশান্তরে সাগর পারেতে।
শিখালেন বিশ্বজনে বেদান্তের মহাশিক্ষা—
"পরমাত্মা প্রকাশিছে সমভাবে
সবার মাঝারে"—এ সত্য মানিয়া
গ্রহণ করিতে সকলেরে সমবোধে
আপন অন্তরে।
স্বীয় গুরুভ্রাতাদের পাঠাইয়া দেশ-বিদেশেতে
অগণিত মঠ আর শিক্ষাকেন্দ্র
লাগিলেন স্থাপন করিতে।
শতবর্ষ পরে আজ তাই দেখি বিস্ময় মানিয়া—
শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মভাবের স্রোত
সারাবিশ্ব ফেলিছে ছাইয়া।
পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির অধ্যাত্ম-জ্ঞানের
অফুরান ভাণ্ডারের ধন—
বিতরণ করিছেন সারাবিশ্বে
বেলুড় মঠের যত আত্মত্যাগী
ভক্তশিষ্যগণ।
জননী সারদা আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী
প্রচার করিতে—
বেলুড় মঠের সৃষ্টি হয়েছে জগতে!

তাঁহাদের আদর্শের অনুগামী এই সব
মঠবাসিগণে—
নিয়ত করিছে ধন্য শ্রীগুরু ও শ্রীমা
অফুরান কৃপা বরিষণে!

ভগবতী মাতা রাখেন যাহারে

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত)

সদ্য-দ্বিখণ্ডিত বঙ্গভূমে
জাতি-বিদ্বেষের ঘৃণ্য রোষবহ্নি
তখনও হয়নি নির্বাপিত বহু স্থানে—
কখনও সহসা হতেছিল ধূমায়িত
সে অনলশিখা স্থানে স্থানে!
পিতা আমাদের গিয়াছিল তাঁর এক
বন্ধুর ভবনে নোয়াখালি গ্রামে—
সে গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে
প্রধান শিক্ষকরূপে বহু সম্মানিত
সে বন্ধুবরের আমন্ত্রণে,
তাঁর আতিথ্য গ্রহণে!
পিতার সে-বন্ধু নিজে সংসার না করি
কাটাতেন একক জীবন—
একান্ন-পালিত নিজ ভ্রাতার সংসার
আর পুত্র--পরিজন,
জানিতেন তিনি তাঁর একান্ত আপন!
বন্ধুর আবাসে দ্বিতীয় দিবসে শোনা গেল
সন্ধ্যাকালে বিধর্মীগণের মারণ-হুংকার—
ভীত-ত্রস্ত গ্রামবাসিগণ নারী আর
শিশুগণে লয়ে আশ্রয় লভিল
সুরক্ষিত বিদ্যালয়-গৃহের মাঝার।

অস্ত্র হাতে পুরুষেরা যত রহিলেন প্রহরায় রত
সেই বিদ্যালয়ের বাহিরে—
সজাগ সতত!
দেখিতে দেখিতে আচম্বিতে সেই শিক্ষকের
কিছু বিধর্মী ছাত্রেরা প্রবেশ করিল
তাঁর গৃহে—পিতার সম্মুখে নিমেষ
মাঝারে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত হানিতে লাগিল
বারংবার শিক্ষকের সর্বদেহে!
আহত শিক্ষক আর্তনাদ করি কহিলেন—
"মোর ছাত্র তোরা এ কী করিলি আমারে,
নাশিলি আমার প্রাণ জাতি-বিদ্বেষের
ঘৃণিত অনলে?"
রক্তাক্ত আহত দেহে উন্মত্তের প্রায়
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন তিনি পুষ্করিণী-কিনারায়।
বাক্‌রুদ্ধ মোর পিতা পাশে দাঁড়াইয়া
দেখিলেন এই দৃশ্য স্তম্ভিত হইয়া!
হিংসায় উন্মত্ত সেই বিধর্মী ছাত্রেরা
আমার পিতারে সম্মুখে পাইয়া
বিধর্মী জানিয়া তবু নবাগত অতিথি বলিয়া
তাঁর দেহ অক্ষত রাখিয়া
গৃহ-ত্যজি গেল বাহিরিয়া!
রুদ্ধবাক্ হতচেতনায় পিতা মোর
সেই পুষ্করিণী কিনারায় জঙ্গল মাঝারে
বসি সারারাত্রি অবিরাম জপিতে লাগিল
শিব-দুর্গা নাম!
রাত্রিশেষে আধো-অন্ধকারে পদব্রজে চলিলেন
বহু দূরে সীতাকুণ্ডে পাহাড়ের 'পরে
দেবীর মন্দিরে!
দিবালোকে সে-মন্দিরে আসি পূজারীগণেরে
পরিচয় দিয়া জানালেন পিতা তাঁর বিপদ-কাহিনী
সবিস্তারে—আশ্রয় নিলেন সেথা
কিছুদিন তরে।

ইতিমধ্যে সারাদেশে ধর্মান্ধ-তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে—
পিতার ভাবনা লয়ে মহা-দুশ্চিন্তায়
আমাদের দিন কাটিতেছে।
অবশেষে ডাকযোগে তাঁর পত্র পেয়ে
দুশ্চিন্তার অবসান হল—
কিছুদিন পরে পিতা দুইজন গুর্খা
দেহরক্ষী সহ বাড়িতে ফিরিল।
তাঁর সেই ভয়ংকর বিপদের কথা জানাইয়া
আমাদের কহিলেন পিতা—
"ভগবতী মাতা রাখেন যাহারে
নিশ্চিত মরণ তারে বিনাশিতে নারে!"

আশিস

আমাদের বাসগৃহ নির্মাণের কালে
পাড়ার একটি ছোট ছেলে
নিয়ত আসিত ঘুরে ফিরে
দর্শন করিত এই গৃহ-নির্মাণের কাজ
কৌতূহল ভরে!
ক্রমে তার সাথে আলাপ জমিয়া গেলে
জানিলাম তার নাম-ধাম—
আর পাড়া-প্রতিবেশীদের পরিচয় আদি
বহু বিবরণ শুনিলাম।
আশিস বিশ্বাস নামে এই বালকের সাথে
ক্রমে সৌহার্দ্য জন্মিল—
দিদিমা ও নাতির মতন
মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল।
গৃহপ্রবেশের শুভ দিনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সনে
বালক আশিসে স্নেহভরে

ডাকি আনিলাম—
পাশে বসাইয়া যত্নে খাওয়াইয়া
তারে তৃপ্ত করিলাম!
সন্ধ্যাকালে আশিস নিয়ত আসিতে লাগিল
পড়াশুনা দেখাইয়া নিতে—
হৃষ্ট মনে সযতনে আমিও তাহারে
লাগিলাম পাঠ্যবস্তু বুঝাইয়া দিতে!
ক্রমে জানিলাম বালক আশিস
বিদ্যালয়ে প্রথম হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে
পড়িতেছে—তারপর বছর বছর
আমার সাক্ষাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে
পড়া শেষ করি উচ্চবিদ্যালয়ে যাইতেছে।
পড়াশুনা আর অঙ্কন-বিদ্যায় অপূর্ব
আগ্রহ দেখিলাম—
জন্মান্তরীণ শুভ-সংস্কারের ফল ইহা
মনে জানিলাম।
পরিচয় গাঢ়তর হতে অষ্টম শ্রেণীতে
আশিস উঠিতে নিয়তির অমোঘ বিধানে—
আমাদের পাড়া ছেড়ে তারে হল যেতে
দূর স্থানে।
আশিসের পিতা এ পাড়ার ভাড়াবাড়ি ছাড়ি
শহরের পূর্বপ্রান্তে জমি কিনিলেন—
সে জমিতে নূতন বাড়িতে তাঁরা
উঠিয়া গেলেন।
ব্যথাভরা বিদায়ের ক্ষণে কিশোর আশিস
সান্ত্বনা দানিল—
"যখনই সুযোগ হবে নিশ্চয়ই
আসিয়া দেখা করি যাব।"
মনে ভাবিলাম বিধির বিধান আত্মীয় কি
অনাত্মীয় সকলের তরে একই সমান—
এ জগতে মানুষের সকল সম্পর্ক

শুধু দু'দিনের তরে,
চিরদিন কেহই কাহারে
পারে না রাখিতে কাছে ধরে!

নৈঃশব্দ্য

নিশীথের সুগভীর নৈঃশব্দ্য মাঝারে
হৃদয়-বীণার-তন্ত্রে যে-সুর ঝংকারে--
সে সুর মূর্চ্ছনা জাগায় অন্তর-তলে
বিশ্ব-আত্মার চেতনা!
দিবসের শতবিধ কর্ম কোলাহল
জীবনেরে করি তোলে অশান্ত চঞ্চল—
ব্যস্ত জীবনের মাঝে অনুক্ষণ
ডুবি রহে মন,
আপনারে অনুভব করিবে কখন!
যে-মহাচৈতন্য বক্ষে শক্তির লীলায়
এই মহাবিশ্বের সৃজন—
তাঁরই পরমাণু হতে রচিত জীবন,
স্রষ্টার মায়াতে মুগ্ধ যত জীবগণ
আপন স্বরূপ তারা জানে না কখনও।
মায়াধীশ স্রষ্টা তাঁর আপন মায়ায়
রচনা করিয়াছেন এ বিশ্ব হেলায়—
জীবগণে করুণা করিয়া যবে
দেন ঘুচাইয়া মায়া-আবরণ,
ঝঙ্কারিয়া ওঠে সেইক্ষণ তার হৃদয়ের বীণা
জাগে অন্তরের তলে বিশ্ব-আত্মার চেতনা।
তাই যুগে যুগে জ্ঞানিগণ সংসার ত্যজিয়া
যান চলি বিজনে-নির্জনে পর্বত গুহায়
আর নিবিড় কাননে—

সুগভীর নৈঃশব্দ্যের মাঝে ডুবি
হৃদয়-বীণার তারে ঝঙ্কার
তুলিতে নিজেরে জানিতে!
স্রষ্টার কৃপার তরে জীবন ভরিয়া
আপনারে রাখে তারা নৈঃশব্দ্যের মাঝে
ডুবাইয়া ধ্যানের গভীরে—
বিশ্ব-স্রষ্টার কৃপায়, কখনও তাঁহারা জানিবারে
পারে আপনায়,
সেইকালে তাঁর জীবদেহ নাশ হয়,
জীবাত্মা তাঁহার বিশ্ব-আত্মার
মাঝারে হয়ে যায় লয়!

শশিকলা

সন্ধ্যার লগনে পশ্চিম গগনে
ক্ষীণকায় দ্বিতীয়ার চাঁদ
জাগে নিজ মহিমায়—
তারপর দিনে দিনে এক কলা
করি বাড়ে আপনার উজ্জ্বল প্রভায়!
পক্ষকাল পূর্ণ যবে হয়
সেই দ্বিতীয়ার ক্ষীণতনু চাঁদে
দেখি জাগিবে বিস্ময়!
ষোড়শ কলাতে পূর্ণশশী
ভুবন গগন প্লাবি রজতধারায়
সন্ধ্যার আকাশে হাসে
অপূর্ব মায়ায়!
তারপর পুনঃ দিনে দিনে
এক কলা করি হ্রাস পেয়ে
পক্ষকাল শেষে—
অপূর্ব মাধুরীময় সেই পূর্ণশশী
রাতের আঁধারে যায় মিশে।

চাঁদের জ্যোৎস্না
পূর্ণিমা-নিশীথে করে পরী-রাজ্যের রচনা—
বিশ্বভুবন মায়াঘেরা স্বপ্নলোক
বলি ভ্রম হয়,
আপনারে সেই জগতের লোক
মনে হয়।
দিবালোকে যে-জগৎ সহস্র কর্মের কোলাহলে
মুখরিত হয়—
জনগণ নিজ নিজ কর্তব্যের মাঝে
ডুবি রয়,
রাতের গগনতলে চাঁদের মাধুরী হেরি
সে জগতে মিথ্যা মনে হয়!
দিবসের আলো আনে জগতের
সত্য পরিচয়—
রবির প্রখর তেজে রহে না কোথাও
ভ্রান্তির সংশয়।
রাতের আঁধারে চাঁদিনী মোহিনী মায়া
দিয়া সত্যেরে আবরি
মিথ্যা ছলনার জালে
জগতেরে রাখে জড়াইয়া!

বনানী

অনাদি সৃষ্টির কাল হতে নিবিড় গহন
বনরাজি বিশাল ভূপৃষ্ঠব্যাপী
বিরাজিছে আপনার মৌনমুখর
মহিমায়—
হিংস্র শ্বাপদেরা নিরাপদ আশ্রয় লভিয়া
পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করিছে সেথায়।

অতি পুরাতন বৃক্ষ যত শাখায় শাখায় জড়াইয়া
দিবালোকে নিশীথের ঘোর অন্ধকার
আনে ঘনাইয়া।
শত শত পক্ষিকুল আশ্রয় লভিয়া
বাস করে বৃক্ষের শাখায়—
আদিম সে বৃক্ষকাণ্ডে কোটরে কোটরে
সরীসৃপ প্রাণী যত নিজেরে লুকায়।
সুনিবিড় বনরাজি আপন স্বভাবে
ঊষর ধরার বক্ষ শ্যামল সরস রাখে
শ্যামলিমা দিয়া
বরিষার মেঘবারি আকর্ষণ করি
মেদিনীর বক্ষ দেয় সজীব করিয়া।
বিচিত্র ভূপৃষ্ঠ ঘেরি প্রকাশিছে কত
বৈচিত্র্যের রূপ—
সাগর-পর্বত-মরু আর মেরু সহ
গহন বনানী অপরূপ!
কুন্তলিনী ধরিত্রীর নিবিড় গভীর কুঞ্চিত কেশের প্রায়—
শ্যামল বনানী শোভা পায়।
প্রান্তরের শ্যামলিমা অঙ্গ-আবরণ রূপে
ধরাবক্ষ নিয়ত সাজায়।
বিশাল সাগর আর নিঃসীম আকাশে চাহি
দৃষ্টি যথা হারাইয়া যায়—
সেইরূপ বনানীর ভয়াল সুন্দর রূপ
সীমাহীন ভীতি সহ বিস্ময় জাগায়!
প্রকৃতির শতবিধ বিচিত্র রূপের মাঝে
বনানীর শোভা অন্যতম—
ভয়ংকর সুন্দরের রূপে মুগ্ধ মন
সে-সৌন্দর্যে রহে নিমগন।
বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি মাঝে
বহুরূপে আপনারে করেন প্রকাশ
ভয়াল-সুন্দর এই গহন বনের রূপ
দানিতেছে তাহারই আভাস!

পুত্র

পিণ্ডদানে নরকাগ্নি হতে উদ্ধার করিবে
পিতা ও মাতায়—
তাই মানুষেরা পুত্র লভিবারে চায়।
কন্যা যবে আসে পুত্রের বদলে
তখন তাহারা দোষে আপন কপালে!
পুত্র লভিবার বাসনায় বিবাহ করিয়া
সংসারী হইতে সবে চায়।
কিন্তু যদি পুত্রার্থীর ঘরে কন্যাগণ
পুনঃপুন করে আগমন—
নিরুপায় পিতা দোষিবে তখন কন্যার মাতারে,
নিজ ভাগ্য-বিড়ম্বনা সহিতে না-পেরে।
ভাগ্যবতী জননী সে জন
যার গর্ভে পুনঃপুন পুত্রদের হয়
আগমন কন্যার বদলে—
সুখ-শান্তি-আনন্দ প্রচুর ঘটে
তাহার কপালে!
কিন্তু চিন্তাশীল যারা
বিচার করিয়া বুঝিবারে পারে তারা—
পুত্র-কন্যা সকল সন্তান
মাতা ও পিতার চোখে
একই সমান।
তাহাদের স্নেহের ছায়ায়
পুত্র আর কন্যা জন্মায়।
সমাজের অন্যায় বিধান
সৃষ্টি করিয়াছে শুধু এই ব্যবধান!
বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবে
নর-নারী উভয়ের মাঝে আর নাই ব্যবধান—
সংসার-সমাজে উভয়েই লভিতেছে
আজ সম-স্থান!
তাই আজ পুত্র কিংবা কন্যা উভয়েরে
জনক-জননী করে সম-ব্যবহার—

শিক্ষা কিংবা সমাজ-জীবনে
উভয়েই লভে সমান সুযোগ
আর সম-অধিকার।
পুত্র আর কন্যা উভয়েই সৃষ্টি বিধাতার—
সংসার জীবনে নর আর নারী রূপে
প্রয়োজন আছে দু'জনার।
সমাজ-মানসে আজ জেগেছে চেতনা—
কন্যাদের তরে আজ করিতেছে
তাই সমান ভাবনা।
পুত্র আর কন্যা উভয়ের প্রতি
সমান সুযোগ আর সম-ব্যবহার—
সংসার সমাজে ঘটাইবে
উন্নতি ও আনন্দ অপার!
তাই আজ কন্যাগণ তুচ্ছ নহে সমাজের চোখে—
পুত্রদের সমান মর্যাদা
তারা লভিতেছে সুখে!

মরণ

আজ মোর জীবনের অন্তিম লগনে
ভাবি মনে মনে—
কবে আসিবে আমার জীবনের সর্বশেষ ক্ষণ
জীবাত্মা যাইবে দেহ ছাড়ি প্রেতলোকে,
জীবদেহ লভিবে মরণ!
প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে দেহ ভস্ম হবে
এক মুষ্টি ছাই শুধু শ্মশান-ভূমিতে
পড়ি রবে।
কোথা সেই প্রেতলোক, যেথায় জীবাত্মা চলি যায়?
নাহি জানি সে লোক কোথায়!

কী আছে সেথায় জানি না তো, হায়,
                শুধু জানি যাইব সেথায়!
বহুদিন পরে পুনঃ জন্ম লইব সংসারে—
        কর্মফল ভোগ করিবারে জীবদেহ লয়ে
            আসিতে হইবে মোরে বারে বারে
                ফিরি এ সংসারে!
আমার এ জীবন যতখানি সত্য
        ঠিক ততখানি সত্যরূপে আসিবে মরণ—
            দেখিয়াছি যে-মরণে
                মোর পিতা, মাতা আর
                    ভ্রাতার জীবনে!
জানি না কীরূপ দীর্ঘ আমার জীবন—
        কার আয়ু কত দীর্ঘ জানে কোন জন?
            দেহের বিকার ঘটি একদিন দেহ নাশ হবে—
                কিন্তু নাহি জানি সেইক্ষণ কবে।
আসিয়াছি এ জগতে পঞ্চভূতে গঠিত
        মাটির দেহ লয়ে—
            জীবাত্মা ছাড়িলে দেহ
                ভৌতিক শরীর মাটির সহিত মিশি যাবে।
জীবন ভরিয়া যেই দেহখানি আমার-আমার
        ভাবি ভোগ করিয়াছি—
            সেই দেহ আজ বার্ধক্যে অচল হয়ে
                শেষের দিনের প্রতীক্ষায় আছি!
যতদিন আছি এ সংসারে
        একান্ত অন্তরে স্মরি শ্রীমায়েরে—
            তাঁর শ্রীচরণে নিয়েছি শরণ
                কাতর অন্তরে।
        মা আমার পতিতপাবনী,
            জানি, সে চরণে মোরে
                লইবেন টানি!

সত্য-শিব-সুন্দর

বিপুল এ মহাবিশ্ব রচেছেন যিনি
সত্য-শিব-সুন্দরের রূপে
বিরাজেন তিনি!
তাঁর অনুভূতি লভিবারে পারে
যেইজন—
সার্থক তাহার এই
মানব জনম!
তাঁর জয়গানে মুখর রয়েছে চরাচর—
রবির কিরণে বিহগ-কূজনে
স্নিগ্ধ সমীরণে প্রচারিছে তাঁর কৃপা
বিশ্ব প্রকৃতি নিরন্তর!
নিঃসীম গগনতলে গ্রহ-তারাদল
আবর্তিছে যুগ যুগ ধরে—
সকলেই সেই সত্য-শিব-সুন্দরের
মহিমা প্রচারে!
বিশাল সাগর আর তুষারমৌলি
গিরিরাজি, শ্যামল বনানী আর
নদনদী যত—
গাহিছে তাঁহারই জয়-গীতি
আপনার নীরব ভাষায় অবিরত!
জীবগণ তাঁহার কৃপায় রয়েছে বাঁচিয়া
এ ধরায়—
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাহারা
হৃদয়ের মৌন ভাষায়!
মানুষেরা বৎসর ভরিয়া তাঁহারে পূজিছে—
অন্তরের অনাবিল কৃতজ্ঞতা
তাঁহার চরণে নিবেদিছে!
জ্ঞানিগণ সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি
লভিবারে আপন জীবনে
করিছে যতন প্রাণপণে—

সংসার ত্যজিয়া বিজনে-নির্জনে
আপনারে ডুবাইয়া রাখি
সুগভীর ধ্যানে!
একমাত্র তাঁর কৃপাবলে
এই অনুভূতি হয় কালে—
কৃপা বিনা তাঁরে কেহ জানিতে পারে না
কোনও কালে!
জীবন ভরিয়া তপস্যা করিয়া তাঁর কৃপা তরে,
সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি জাগে
যাহার হৃদয়ে—
ধন্য হয় তাহার জীবন
পূর্ণ হয় তাহার সাধন
তাঁর কৃপা পেয়ে!

কলির গীতা

দ্বাপর যুগেতে একবার হয়েছিল উচ্চারিত
গীতাতত্ত্বসার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীমুখ হইতে।
এ ঘোর কলিতে পুনঃ উচ্চারিত হল
সেই দিব্যবাণী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখেতে—
কলির তমসাচ্ছন্ন জীবেরে বাঁচাতে!
পুণ্যবতী রানী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত
দেবী ভবতারিণী-মন্দিরে
দক্ষিণেশ্বরে—
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রচিলেন
লীলাক্ষেত্র তাঁর অতীব যতনে
ধীরে ধীরে!

গৃহী আর যুব-ভক্তগণে আকর্ষণ করি
আনিলেন ক্রমে ক্রমে—
সাধিবারে আপনার উদ্দেশ্য মহান
কলি-জীবে করিবারে ত্রাণ!
শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গল ইচ্ছাতে গৃহীভক্ত
শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাগিলেন সুগোপনে
সংগ্রহ করিতে তাঁর শ্রীমুখের বাণী যত
আপনার দিনলিপিকাতে।
শ্রীগুরু তাঁহার গৃহী আর যুব-ভক্তগণে
প্রতিদিন করিতেন যত উপদেশ
সংসার জীবনে পথ-নির্দেশিতে—
সে সকলে শ্রীমহেন্দ্র রাখিতেন
লিখি সযতনে জগতের হিতে!
এইরূপে দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া
যত উপদেশ আর জীবনের পথ-নির্দেশ
দানিয়া ছিলেন গুরুদেব তাঁর ভক্তগণে—
সে সকলে জগজন তরে
লিখি রাখি একনিষ্ঠ মনে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রাখিয়া গেলেন
অনুপম কীর্তি এ ভুবনে!
গুরুদেব এ মরজগৎ ত্যজি গেলে
শ্রীমা সারদার আশিস লভিয়া,
শ্রীগুরুর শ্রীমুখের বাণী যত
ছিল সংগৃহীত সে সকলে গ্রথিত করিয়া,
কথামৃত নামে পাঁচ খণ্ড গ্রন্থ রচি
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রহিলেন
অমর হইয়া!
এই গ্রন্থ *কথামৃত* হইল সৃজিত
কলিযুগ তরে—নব কলেবরে
গীতার আকারে!
এ নবীন "গীতা-উপদেশ" অন্তরে মানিয়া
একনিষ্ঠ মনে আপন জীবনে

সাধন করিতে পারিবে যে-জন—
কলির গহন পঙ্ক হতে তাঁর কৃপাবলে
উদ্ধার পাইয়া সার্থক হইবে
তার মানব জনম!

অস্তরাগ

অপরাহ্ণ গগনের ভারে অস্তরবি ঢালে
গলিত সুবর্ণ সম অস্তরাগ-ধারা—
সে রাগধারায় স্নাত রূপসী প্রকৃতি
অনুপম মাধুরীতে জাগায়
নিখিল-প্রাণে অরূপের সাড়া!
জলে-স্থলে-অরণ্যে-পর্বতে সে রাগ ছড়ায়
রাশি রাশি স্বর্ণরেণু অপার কৌতুকে—
সে রাগ পরশে ধরা মুহূর্তের তরে
পরিণত হয় স্বপ্নলোকে!
অস্তরবি-রাগ অনুপম মাধুরীতে ভরা—
কিন্তু সে মাধুরী প্রকাশে জগতে
শুধু ক্ষণকাল তরে,
সন্ধ্যার কালিমা নামি মুছি দেয়
সে মহিম রূপ ক্ষণ পরে!
প্রভাত রবির শোভা হেরি জগৎ মোহিত—
মধ্যাহ্ন-রবির খরতেজে বিশ্ব কর্ম্মরত,
অস্তরবি জগতেরে বিদায় জানায়
আবিরের রঙে রাঙা মৌন-মহিমায়!
রবির কিরণ দান করে ধরার জীবন—
জগৎ রয়েছে বাঁচি রবিরে পাইয়া,
জীব জগতের প্রাণীকুলে প্রাণদান
করিতেছে রবি আপনার কিরণ ঢালিয়া।

প্রভাতের রবি নয়ন মেলিয়া জানায়
জগতে আশীর্বাদ—
মধ্যাহ্ন গগনে আসি বিশ্বের
জড়তা নাশি ঢালি দেয়
তাপের প্রসাদ।
অপরাহ্নে ক্লান্ত রবি জগতেরে জানায় বিদায়—
অপরূপ রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া ধরা
আপনার স্নিগ্ধ মহিমায়!

একের বিজ্ঞান

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত।)

একের বিজ্ঞানী জানে আর মানে
সেই একে—বিশ্বচরাচর অন্তর-বাহির
সর্বত্রই সেই একেরেই দেখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যাহা কিছু
দেখা-শোনা-জানা—
সবই সেই একের মহিমা।
এক ভিন্ন তাঁর চক্ষে বহু কোথা নাই
"বহু রূপে বহু নামে বহু ভাবে"
সেই এক বিরাজ করিছে সর্বত্রই!
সীমাহীন মহাবিশ্ব অন্তহীন নক্ষত্র-জগৎ
অগণিত নীহারিকা আর ছায়াপথ
ধাইয়া চলেছে অন্তহীন বেগে
যুগ হতে যুগে—
সকলই সে একের স্বরূপ,
বহুরূপে প্রকাশিছে আপনারে
চিরদিন ধরে,
একের বিজ্ঞানী শুধু জানেন তাঁহারে,

এক ভিন্ন বহু নাই বিশ্বচরাচরে!
মায়াধীশ সেই এক সামান্য জীবেরে
রাখিয়াছে মুগ্ধ করি আপন মায়ায়—
তাঁর কৃপাবলে মায়া-আবরণ ঘুচি গেলে
অনুভবে একেরে সে পায়।
যুগে যুগে জ্ঞানিগণ সেই কৃপা তরে
বিজনে-নির্জনে অরণ্য-গহনে
আছেন নিরত সাধনায়—
খুঁজিয়া পাইতে সেই একে
আপনার হৃদয়-গুহায়!
বহু সাধনায় দীর্ঘ তপস্যায় যেইজন
পারে তাঁর কৃপা লভিবারে—
জীবন তাঁহার পরিপূর্ণ হয়—
সচেতন ভাবে থাকি
একের মাঝারে!

দশানন-বধ কথা

গোলোকের নারায়ণ করিলেন আগমন
দ্বাপরের ধরাভার হরিতে—
নররূপে চারিদেহে জনম লইয়া
এই মহীতে!
অযোধ্যা-পুরীতে দশরথ গৃহেতে
শ্রীরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন রূপেতে-
অসুর-শক্তি নাশি
ধরণীর পাপরাশি হরিতে।
পিতার সত্যবাণী রাখিতে
ত্যজিয়া সিংহাসন শ্রীরাম গেলেন বন
চতুর্দশ বৎসর তরেতে—

সতী-সীতা অনুগামী হইলেন সাথেতে
কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ তিনিও চলেন বন
জ্যেষ্ঠের পিছেতে।
দণ্ডক-অরণ্য মাঝেতে পর্ণকুটীরে বাস কালেতে—
দুরাচার পাপিষ্ঠ দশানন
জানকী মায়েরে ধরি বলেতে
লয়ে গেল রথে তুলি সাগরের পারেতে
সুবর্ণ লঙ্কাপুরীতে।
ঘরে ফিরি সীতারে না-পাইয়া
বিপন্ন রঘুবীর হইয়া অস্থির
কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ সাথেতে
করিতে অন্বেষণ
লাগিলেন বনে বনে ভ্রমিতে—
অশান্ত মনেতে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাহাড়ে বনেতে
আসিলেন কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে—
মিলিলেন কপিরাজ সুগ্রীব সাথেতে,
মিত্রতা স্থাপিয়া কপিসেনা লইয়া
জানকীরে উদ্ধার করিতে
চলিলেন লঙ্কাপুরীতে!
সাগরের উপরে গাছ আর পাথরে
সেতু রচি চলিলেন সুবর্ণ-পুরীতে—
ঘোরতর যুদ্ধে নর আর বানরে
পাপিষ্ঠ দশাননে সবংশে নাশিতে।
দেব বলে বলীয়ান রাবণ রাজার প্রাণ
রয়েছে সুরক্ষিত যতনে—
স্ফটিক-স্তম্ভ মাঝে বাণ এক
রাখা আছে
উহাই বধিবে রাজা রাবণে!
ছদ্মবেশে হনুমান জানি লয়ে সন্ধান
করিল স্তম্ভখান খানখান—
লইয়া মৃত্যুবাণ যেথায় শ্রীপ্রভু রাম
দিলেন তাঁহার হাতে তুলিয়া!

সেই বাণে দশাননে বধিয়া,
ভ্রাতা-পুত্র সহ তারে সবংশে নাশিয়া—
সতী সীতাদেবী আর লক্ষ্মণ-হনুমান সাথেতে
রঘুপতি রাজারাম হরষিত প্রাণখান
চলিলেন পুষ্পক-রথেতে,
ফিরিলেন অবশেষে অযোধ্যা পুরীতে!

একই চাঁদ রোজ রোজ

(শ্রীমা সারদাদেবীব বাণীর অনুসরণে বচিত)

যুগ-প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন নারায়ণ
এই ধরণীতে—নব নব রূপে,
অধর্মের বিনাশ সাধিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিতে!
সত্যযুগে সত্যনারায়ণ রূপে
আসেন মরতে—সত্যের স্বরূপ
প্রচারিতে!
ত্রেতাযুগে তাঁরে হইল আসিতে
চারি অংশে জন্মিলেন তিনি অযোধ্যাতে—
শ্রীরাম, ভরত আর শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ বেশেতে,
দুরাচার রাক্ষস রাবণরাজে বধি
সত্যধর্ম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতে!
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে পুনঃ জন্মিলেন
অত্যাচারী দৈত্যরাজ কংস-কারাগারে—
কিশোর বয়সে মল্লযুদ্ধে কংসের জীবন নাশি
উদ্ধার করেন কারাগৃহে-অবরুদ্ধ পিতা ও মাতারে।
দেশব্যাপী কংস হেন দুরাচার যত রাজশক্তি
বিনাশিতে রচি পুনঃ কুরুক্ষেত্র রণ—
অসুর শক্তিরে নাশি ভারতের বুকে
করিলেন ধর্ম সংস্থাপন!

কলিযুগে বারবার আসিতে হইল তাঁর
কলির পাতক নাশি ধর্ম প্রতিষ্ঠিতে—
শ্রীচৈতন্য-প্রভু রূপে অবতরি ধরণীতে
অত্যাচারী রাজশক্তি প্রতিহত করি
ডুবাইয়া দিলেন দেশেরে
হরিনামের বন্যাতে!
সারা দেশে হরিনাম প্রচার করিয়া
কলির পাতকরাশি দিলেন মুছিয়া!
সুদীর্ঘ কলির শেষে পাপবৃদ্ধি হল দেশে,
ধর্মগ্লানি বিদূরিতে অবতরি আসিলেন
পুনঃ নারায়ণ—ত্রেতা-দ্বাপরের
অবতার রাম আর কৃষ্ণ এইবার
আসিলেন এক দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ
নাম করিয়া গ্রহণ!
শ্রীরামকৃষ্ণের সুবিপুল অধ্যাত্ম-চেতনা
শিষ্যগণ মাঝে সঞ্চারিত হয়ে সারাবিশ্ব
প্লাবিত করিল—সেই চেতনার স্রোত
দীর্ঘকালব্যাপী জগৎ-কল্যাণে
নিরত রহিল।
যে-মহাচৈতন্য এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ
তাঁহারই ইচ্ছায় যুগে যুগে একই নারায়ণ
নবরূপে নবীন হইয়া আগমন করেন
ধরায় অধর্মে বিনাশি সত্যধর্ম
প্রতিষ্ঠায়—
যেইরূপ দেখা যায় প্রতিদিন
একই চাঁদে আকাশের গায়ে,
নবরূপে নবীন আকারে
নব সুষমায়!

নিত্য ও অনিত্য

মায়াময় অনিত্য সংসারে
নিত্যসত্য ভগবানে আশ্রয় করিয়া
থাকিবে, যে-জন—
সার্থক হইবে তার এ নশ্বর
মানব জনম!
অনিত্য সংসারে দারা-পুত্র-পরিজন লয়ে
সংসারী মানুষ পরম নিশ্চিন্তে বাস করে—
জানে না তাহারা কিংবা ভাবে না কখনও
কেন জন্ম হয়েছে সংসারে,
কী উদ্দেশ্য সাধনের তরে!
জন্মিয়া ধরায় নিজ নিজ সংসারের দায়িত্ব
পালন তরে বহুবিধ কর্ম্মজালে জড়াইয়া,
হায়, অমূল্য মানব জন্ম
বৃথা কেটে যায়!
অবশেষে যবে সংসারের বহুতর দুঃখ-কষ্ট
রোগ-শোক-ব্যাধি আর জরা ও মরণ
আপন সংসারে আর জগতের চারিধারে
হেরি জীবনের অনিত্যতা
অনুভব করে—
সেইক্ষণ অতি ধীরে ধীরে নিত্যের
সন্ধানে মন ফিরে!
নিত্যসত্যে জানিবার তরে হৃদয়ের এই
আকুলতা যবে সীমানা ছাড়ায়—
বিধির কৃপায় পথের সন্ধান
মিলি যায়।
গুরুরূপে আসি ভগবান দেন তারে
পথের সন্ধান—জানান তাহারে,
সংসারে মানব জন্ম
শুধুমাত্র ভগবানে জানিবার তরে!
সংসারীর কর্তব্য হইবে—নিত্যসত্য শ্রীভগবানের

শ্রীচরণে রাখি এক হাত, অন্য হাতে
সংসারের কর্তব্য সাধিবে,
সে কর্তব্য শেষ হলে উভয় হাতেতে
তাঁর চরণ ধরিবে!
অনিত্য এ জগৎ সংসার শুধুমাত্র
কর্মক্ষেত্রস্বরূপ জানিবে—
কর্ম শেয হলে অনিত্য সংসার ত্যজি
মানবের পরম আশ্রয়
নিত্যসত্য শ্রীহরির
চরণে মিলিবে!

শরৎ

শিউলি ঝরানো শিশিরে ভেজানো
শরৎ এলো ধরায়—
কাশফুল বনে শিহরন এনে
মা'র আগমনী গায়!
কূজনে মুখর ভোরের দোয়েল
আগমনী গান শোনাল—
শারদ-রবির স্নিগ্ধ পরশে
বিশ্বভুবন জাগিল!
আকাশে বাতাসে সারা দিক্‌দেশে
শরৎঋতুর হিমানী-পরশে
আশার-বারতা ঘোষিল—
মা'র আগমন জগৎবাসীরা
জানিল।
প্রতি বৎসর শরৎ আসিয়া
মা'র আগমন-বারতা বহিয়া
জগৎজনের তাপিত হৃদয়
আনন্দে দেয় ভরিয়া—

বিশ্ব-প্রকৃতি মা'র জয়গানে
নিশিদিন রহে মাতিয়া।
অসুর-দলনী শারদা জননী
ভক্তজনেরে কৃপা-প্রদায়িনী
আসেন নামিয়া মরতে—তাপিত জগতে
শান্তি ও কৃপা দানিতে।
মা'র আগমন ধরাতে—
বিশ্ববাসীর মনের গহনে
অশুভ-অসুরে নাশিতে!
শুভ প্রেরণায় হৃদয় ভরিয়া
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দানিয়া
জগতের বুকে চিরকল্যাণ
আনিতে!

শ্রাবণ

আসিল শ্রাবণ—
অবিরাম ধারা-বরিষণে
ভাসিল ভুবন!
ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জমেঘে আকাশ ছাইল—
দিবসেতে রজনীর ভ্রম
আনি দিল।
নদ-নদী যত জলের প্লাবনে ভাসি
হোল একাকার—
জলভরা প্রান্তরের সাথে
রহিল না পার্থক্য তাহার।
ঘনঘন মেঘের গর্জনে আর
অশনি পতনে—
আনিল প্রাণের মাঝে
শঙ্কা অজানার।

ভীত-ত্রস্ত প্রাণীকুল অরণ্য-গহনে
আর পর্বত-গুহায়—
ছুটি চলে আশ্রয় আশায়।
হিংস্র শ্বাপদেরা খাদ্য অন্বেষণ ত্যজি
খুঁজি ফিরে আশ্রয় কোথায়।
নিদাঘের তাপদগ্ধ ধরা
অবিরাম ধারাস্নানে সুস্নিগ্ধ হইল—
নিবিড় বনানী আর প্রান্তরের বুক
শ্যামল-শ্রী ধারণ করিল।
জগৎবাসীরা বিধাতার আশীর্বাদ সম
শ্রাবণেরে জানে—
বসুন্ধরা ফলে-শস্যে পরিপূর্ণ হয়
এই বারির কল্যাণে।
জীবের কল্যাণ তরে বৎসরের ছয় ঋতু
বিধির সৃজন—
প্রতিটি ঋতুই এই জগতের
মঙ্গল কারণ।
জীব-স্রষ্টা ভগবান জীবগণে মাতৃস্নেহে
করেন লালন—
দিন-পক্ষ-মাস-ঋতু বৎসরাদি
রচনা তাঁহার অনুপম
স্নেহ-নিদর্শন!

কর্ণফুলি নদী

আমার শৈশব-সাথী তুমি,
নদী কর্ণফুলী,
জীবনে তোমারে কভু
ভুলিব না আমি।

তোমার স্মরণে অপার আনন্দ
জাগি উঠে মোর প্রাণে।
চট্টলা মায়ের আদরিণী কন্যা তুমি,
আছ জননীর ক্রোড়ে
স্নেহের ছায়ায়—
আমার দুর্ভাগ্য তাই আসিতে হয়েছে
মোরে জন্মভূমি ত্যজি আজ
পশ্চিম বাঙলায়।
আশৈশব ছিলে তুমি মোর সাথী হয়ে
সেই চট্টলায়—যেখানে জন্মেছি আমি
পিতৃগৃহে পূর্ব বাঙলায়।
সেই স্মৃতি ভুলিতে পারিনি আজও,
হায়!
পার্বত্য প্রদেশ হতে নামি
দীর্ঘ সমতল অতিক্রমি
মিলিয়াছ বঙ্গ-উপসাগর বেলায়—
পথিমধ্যে মোদের গৃহের উন্মুক্ত মাঠের ধারে
সাথীরূপে পেয়েছ আমায়।
শীত-গ্রীষ্ম-বাদলের দিনে
তোমারে খেলার সাথীরূপে
পেয়েছি আমরা ভাইবোনে।
জোয়ারের জলরাশি বিপুল বিস্তার
মাঠেরে করিয়া দিত যবে
নদীর আকার—
সেই কালে মাতিতাম মোরা ভাইবোনে
খেলিতাম জলখেলা অধীর আনন্দে
তোমা সনে।
কখনও বা জলেতে নামিয়া
খেলিতাম মোরা কুতূহলে—
ছোট ছোট মাছ আর
কাঁকড়া-শিকার খেলা ভাইবোনে মিলে।
তোমার পশ্চিম কূলে আমাদের বাড়ি

অতি ভোরে উঠি মোরা যাইতাম ছুটি
তব ধারে, দেখিতাম সূর্যোদয়
তব পূর্ব পারে।
রক্তিম অরুণরাগে পূবের আকাশ
যবে রাঙিয়া উঠিত—
সেই স্বর্ণবর্ণ তোমার জলেতে
প্রতিবিম্বিত হইয়া
অপরূপ স্বপ্নরাজ্য
রচনা করিত।
এ জীবনে তোমা সনে হবে না মিলন কভু আর—
কিন্তু তব সুখস্মৃতি অন্তর-গহনে
চির-জাগরূক রহিবে আমার!

শেফালিকা

শারদ-প্রভাতে শেফালি-সুবাসে
মাতাইয়া প্রাণ-মন
মা'র আগমন বারতা আনিল
প্রভাতের সমীরণ।
শুভ্র-বরণা শেফালিকা ফুল
বৃক্ষের শিরে শোভিছে অতুল—
লুব্ধ ভ্রমরে করিয়া আকুল
অনুপম সৌরভে।
শারদ-প্রভাত ধন্য হইল
শেফালির গৌরবে।
গৈরিক তার বৃন্তের 'পরে
শ্বেত দলগুলি জাগে থরে থরে
নিশা-অবসানে ঝরিয়া ঝরিয়া
সাজায় সে ধরণীরে।

গন্ধে বরনে জাগি উঠে প্রাণে
আনন্দ শিহরন—
অন্তর বুঝি অনুভব করে
জননীর আগমন।
মায়ের চরণ পরশের তরে
ফুটিছে শেফালি অনুরাগ ভরে
বৃক্ষের শির আলোকিত করে
নিশীথের অন্তরে—
ঊষা-আগমনে জননী-চরণে
নিবেদিতে আপনারে!
ধন্য হয় যে শেফালি কুসুম
মায়ের চরণ পরশে—
বরষে বরষে আগমন তার
সার্থক হয়ে ওঠে বার বার
জননীর তরে জনমি ধরায়
আপন প্রাণের হরষে!

রঙ্গন ফুল

গুচ্ছ গুচ্ছ রঙ্গন কুসুম
ফুটিয়াছে গাছের শাখায়—
প্রভাত সমীর স্পর্শে
দুলিতেছে অপূর্ব শোভায়!
অনুপম এ কুসুম ফুটিয়াছে
উদ্যান উজলি—
নয়নরঞ্জন বর্ণে প্রাণেরে আকুলি!
গুচ্ছভরা অপরূপ রক্তবর্ণ
পুষ্পের বিভায়
বিমোহিত প্রজাপতি দল
ওড়ে চঞ্চল পাখায়।

গন্ধহীন এ কুসুম সমাদৃত
রূপের বিভবে—
রূপ হেরি মুগ্ধ আঁখি
গুণে বিস্মরিবে!
কুসুমের সার্থকতা দেবের পূজায়—
গাছের শাখায় হেলি-দুলি
রূপসী রঙ্গন ফুল
নিবেদন করে আপনারে
দেবতার পায়!

ভগিনী নিবেদিতা

বিদেশী তরুণী তুমি
গুরুপদে চিত্তসমর্পিতা
ভারত-সংস্কৃতি লভি
ভারত-কল্যাণে জীবন নিবেদি
হয়ে গেছ তুমি "নিবেদিতা"!
জন্ম তব সুদূর বিদেশে
সাগরের পারে—
লভিলে আপন গুরুরূপে
ভারতীয় এক যুব-সন্ন্যাসীরে।
আত্মত্যাগ বিশ্বপ্রেম আর সেবাগুণে
ভারতীয় রমণীর আদর্শ লভিয়া
সার্থক করিলে আপন জীবনে!
কিশোর বয়সে তব স্বদেশেতে
হয়েছিলে অনুরাগী
ভগবান যিশুর বাণীতে—
অনুভব করেছিলে ধর্মের মহিমা
আপনার প্রাণের আলোতে!

সেইকালে সেবার আদর্শে তুমি
স্বদেশের অনাথ আশ্রমে—
সর্বহারা শিশুদের লয়ে
গঠন করিলে বিদ্যালয়
আপন উদ্যমে।
বয়সের পরিণতি সনে
আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটন স্পৃহা
উঠিল জাগিয়া তব মনে।
ক্রমে সেই ব্যাকুলতা সুতীব্র হইলে
সহসা একদা ভারতের বৈদান্তিক
সন্ন্যাসীর দর্শন লভিলে।
ভারতীয় বেদান্তের সুমহান বার্তা প্রচারিতে
তেজস্বী সন্ন্যাসীবর ভ্রমিতে ছিলেন
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেতে—
দৈবযোগে সেইকালে তুমি
তাঁর সাক্ষাত লভিলে
ভারতীয় সন্ন্যাসীরে গুরুপদে বরি
স্বদেশ হইতে ভারতে আসিলে।
সন্ন্যাসী সঙ্ঘের জননী সারদা দেবী
গ্রহণ করেন তোমা একান্ত আদরে—
তুমি ও তোমার গুরুভগিনীগণ
"মাতা" বলি জানিল তাঁহারে।
পরাধীন ভারতের পতিত দুর্গত
যত অসহায়গণে
সেবাদানে দুঃখ নিবারিতে—
গুরুর নির্দেশে সুবিশাল কর্মযজ্ঞে
তব সর্বশক্তি নিয়োজিতে
আসিলে স্বদেশ ত্যজি
ভারতভূমিতে!

নগরে সহসা প্লেগ মহামারী দেখা দিলে—
গুরুভ্রাতাদের সনে মিলি
সেবার মহান ধর্মে
তুমি ব্রতী হলে।
ভারতের যত তীর্থ দর্শন মানসে
গুরুভ্রাতা আর গুরুভগিনী সহ
গেলে চলি শ্রীগুরুর সনে
ভারতের নানা তীর্থস্থানে।
এইরূপে ভ্রমি ক্রমে ক্রমে ভারতের
যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিলে—
ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিয়া
ভারতের সেবাকার্যে জীবন সঁপিলে।
শ্রীগুরুর লোকান্তর ঘটিবার পরে
সার্থক করিতে তব গুরুর ইচ্ছারে—
স্থাপন করিলে তুমি ভারতীয় নারীদের
কল্যাণের তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় এক
যত্ন সহকারে।
স্বদেশ হইতে অর্থ-সাহায্য আনিলে
বিদ্যালয় তরে—
সেবিতে লাগিলে পতিত দুর্গত যত
ভারতবাসীরে বিবিধ প্রকারে।
দীর্ঘকাল ভারতের সেবাকার্যে
আপন জীবন নিবেদিয়া—
জয় করি নিলে তুমি ভারতের হিয়া!
পরাধীন ভারতের মুক্তি লাগি
বিদ্রোহী ভারতবাসিগণে
সাহায্য দানিলে—
ভারতেরে আপন স্বদেশ সম
গ্রহণ করিলে!
অতি স্বল্প পঞ্চত্রিংশ বৎসরের
জীবনখানিরে—
ভারতসেবার মাঝে
উৎসর্গ করিলে!

ক্লান্ত দেহে স্বল্পকাল বিশ্রামের আশে
হিমাচল মূলে দার্জিলিং শহরে
আসিলে অবশেষে!
প্রাণঘাতী আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া
সেইকালে—জীর্ণদেহখানি ত্যজি
শ্রীগুরুর চরণে মিলিলে!

গৃহ

আদিম মানব ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতে
হয়ে অসহায়—লভিত আশ্রয়
বৃক্ষের কোটরে কিংবা
পর্বত-গুহায়।
ক্রমে তারা প্রস্তরখণ্ডের ব্যবহার করি
সৃজিতে লাগিল গুহা
কত রকমারি!
ধীরে ধীরে আরও পরে ক্রমে
প্রস্তর ঘর্ষণে
নানাবিধ শস্ত্রের আকার দানে
সক্ষম হইল।
সুতীব্র সে ঘর্ষণের কালে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হেরি
বিস্ময় মানিল।
কালক্রমে সে অনলে প্রজ্বলিত রাখার
ভাবনা মানসে উদিল—
বহু চিন্তা আর চেষ্টার সহায়ে
সেই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে শিখিল।
আরও বহুকাল পরে সে অগ্নির ব্যবহার

হইতে হইতে—আদিম মানব
অগ্রসরি গেল ধীরে সভ্যতার পথে!
এইরূপে ক্রমে অবিরত চিন্তা
আর চেষ্টার মাধ্যমে নানাবিধ গৃহ
তারা লাগিল সৃজিতে—
শিশু-সহ নারীগণে রাখি গৃহে শান্ত মনে
সক্ষম হইল পুরুষেরা
জীবন-সংগ্রামে মন দিতে।
আজিকার সুসভ্য মানবগণ
ভাবিতে পারে না—
সেই আদি-মানবের
শতবিধ জীবন-যন্ত্রণা।
হেরি আজ দিকে দিকে মহানগরীর বুকে
সুউচ্চ গৃহের সমারোহ—
আদি জীবনের সেই ভয়াবহ গৃহকষ্ট
পারে না চিন্তিতে আজ কেহ!
সাগর-পারের দেশ যত সভ্যতার
উচ্চ শৃঙ্গে চড়ি—
নির্মাণ করিছে শত শত শততল বাড়ি
কত রকমারি!
বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি হেরি
অন্তরের তলে অনুভব করি—
বিধাতা স্বয়ং মানব-মুরতি ধরি
আছেন সৃজনে রত এ জগৎ ভরি!
আজি তাই দিকে দিকে হেরি
অগণিত গৃহ-সহ শত শত নগর-নগরী
বিরাজিছে দেশে দেশে
কিবা মনোহারী!

চতুরাশ্রম

পুরাকালে হিন্দুগণ শাস্ত্র অনুসারে
চতুরাশ্রম নীতি করিয়া পালন
কাটাতেন আপনার
মানব জীবন!
ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আর
সন্ন্যাস জীবন—এ চতুরাশ্রম
যথাযথ রূপে তাঁরা করেন পালন।
এ ঘোর কলিতে চারি আশ্রমের নীতি
হয় না পালিত—ব্রহ্মচর্য আর
গার্হস্থ্য জীবন মাত্র হয় অনুসৃত।
শৈশব হইতে অধ্যয়ন কালাবধি
দেহসুখ আর আলস্য ত্যজিয়া
সুকঠোর যেই ছাত্রের জীবন পালন করিয়া
তারা চলে—তাহারেই ব্রহ্মচর্য
আশ্রম বলিয়া মানিবে সকলে।
বিবাহিত হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশিলে
গার্হস্থ্য আশ্রম শুরু হয় সেইকালে—
সাধ্যমতো চেষ্টা যত্ন করি
সংসার জীবনে শান্তি ও আনন্দ
প্রতিষ্ঠিলে, সংসার-আশ্রমে বাস
সার্থক হইবে সেইকালে!
বানপ্রস্থ আশ্রমের নীতি অনুসারে
গার্হস্থ্য আশ্রম শেষে পুত্রদের 'পরে
সংসারের দায় সমর্পিয়া
যাইবে চলিয়া আশ্রম-আবাসে—
কাটাইবে আশ্রম জীবন সেথা
অবিরত ভগবানে স্মরি জীবনের শেষে!
বানপ্রস্থ-আশ্রম জীবন অন্তে
অবশিষ্ট কাল
গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-জীবন
গৃহ ত্যজি কাটাইবে আমরণ

নিঃসঙ্গ একেলা
ভগবানে সমর্পি জীবন!
শেষোক্ত আশ্রমদ্বয় করিতে পালন
শাস্ত্র মতে—"অন্নগত প্রাণ" আর
এ স্বল্প আয়ুতে হয় না সুসাধ্য কারও
এ ঘোর কলিতে!

স্মরণ

(বিগত ২৪-১০ ও ২৬-১০-২০০০ শ্রীশ্রীমা'র দর্শন লাভের স্মরণে)

শ্রীশ্রীমা আমার, বিগত বৎসরে এই দিনে
লভিয়াছি তব পুণ্য-দর্শন-স্পর্শন—
সে অপূর্ব স্মৃতি মানসে উদিত হয়ে
আজি আকুল করিছে প্রাণ-মন।
মাগো, তোমার দর্শন পাইব কি এ জনমে আর—
ভাবি বার বার।
কত পুণ্য ছিল মোর জনমে জনমে
জীবন সার্থক হল তোমার দর্শনে!
তোমার স্মরণে মনে জাগে আনন্দ অপার—
তোমার কৃপার কথা ভাবি
বার বার!
তব স্নেহ-উপহার অনুপম শাড়ির পরশে
হৃদয় ভরিয়া উঠে
অপূর্ব হরষে!
জননীগো, কেন এত ভালোবাসা দিয়া
মোর হৃদয় হরিলে—
মোর এই মানব জনম
ধন্য করি দিলে!
তোমার মাঝারে জগৎ-জননী
মোরে দিলেন দর্শন—

মানিলাম মনে
মোর সার্থক জনম!
জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ঘটিল আমার
এ জীবন ভরি দিল
করুণা তোমার!

আবাহন

শারদ রবির উজল কিরণে
বর্ষা-ক্ষান্ত সুনীল গগনে
পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র অভ্র
ভাসে সমীরণ ভরে,
কুসুমিত বনে দোয়েলের গানে
কাশ-কুসুমের মৃদু শিহরনে
বিশ্বভুবন করে আবাহন
দশভুজা জননীরে!
জগৎবাসীর আকুল আহ্বানে
আসিবে জননী বরাভয় দানে
দশভুজে দশ প্রহরণ ধরি
অসুর নিধন তরে!
অশুভ অসুরে ধ্বংস করিয়া
মরতের যত পাপ বিদূরিয়া
কল্যাণ-স্রোতে বিশ্ব প্লাবিয়া
শান্তি দিবেন ফিরে।
শুভ শঙ্খের মঙ্গল রবে
ঢাকের নিনাদে জন-কলরবে
মুখর হইবে দিক্‌দিগন্ত
আনন্দ-উৎসবে।

শারদা জননী কৈলাস হতে
পিতার ভবনে মর্ত্যভূমিতে
বৎসরান্তে শারদ ঋতুতে
হরষিত চিতে আসিবে।
পিতার আলয়ে হিমালয় ক্রোড়ে
মাতা মেনকার সোহাগে আদরে
বাস করিবেন তিনদিন তরে
পরমানন্দ ভরে!
মা'র আগমনে তিনদিন ধরে
মাতিবে জগৎ আনন্দ ভরে
পূজিবে মায়ের রাতুল চরণ
একান্ত অন্তরে।
জানাবে প্রণতি জননী-চরণে
ভক্তি-আনত শিরে!
প্রতি বৎসর মাতা শারদায়
বিশ্ব-প্রকৃতি আহ্বান জানায়
জনগণ তাহে কণ্ঠ মিলায়
আগমন তরে এ ধরায়—
সেই আবাহন সার্থক করি
আসেন জননী কৈলাস ছাড়ি
গ্রহণ করেন ভক্তি-অর্ঘ্য
বিগলিত করুণায়!

চিন্ময়ী

মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী জননী
ভক্তজনের ক্রন্দন শুনি
প্রকাশিতা হন স্বরূপ আবরি
মর্ত্যের আঙিনায়—

ভক্তজনের হৃদয়-বেদনা
দূর করি দেন দিয়া কৃপাকণা
মুছাইয়া দেন অশ্রু সলিল
বিগলিত করুণায়!
অরূপ ব্রহ্ম শক্তি সহায়ে
প্রকাশিতা হন ভক্ত হৃদয়ে
আলোকিত করি হৃদয় তাহার
অনুপম সুষমায়—
অন্তরতলে সে রূপ নেহারি
অভিভূত প্রাণে আপনা পাশরি
সার্থক মানে সাধনা তাহার
জননীর করুণায়!
অতি সুকঠোর সাধনার শেষে
সফলতা লাভ করি অবশেষে
ভক্ত-হৃদয় পুলকে আবেশে
জানে চিন্ময়ী মায়ে—
সেই অনুভূতি লভিয়া হৃদয়ে
বিশ্ব-ভুবন একে মিলি যায়—
জননীর সাথে প্রভেদ হারায়
চেতন-সাগরে অভেদে
মিশিয়া যায়!

বিসর্জন

শারদ শুক্লা-দশমী তিথিতে
বেদনা জাগায়ে ভক্তের চিতে
ফিরিয়া গেলেন জননী শারদা
হিমালয় ক্রোড় হতে—
শিবের আলয় কৈলাস নগরীতে!

তিন দিবসের পূজা অবসানে
জগৎবাসীরা বিষাদিত মনে
মিনতি জানায় মায়ের চরণে
ভক্তি-আনত চিতে—
বৎসরান্তে শারদ ঋতুতে
আবার ফিরিয়া আসিতে!
দশমী দিবসে পূজা শেষ হলে
ভক্তেরা মিলি নয়ন-সলিলে
প্রতীক-প্রতিমা গঙ্গার জলে
ভাসাইয়া ফিরি আসিল—
জনক-জননী আদি গুরুজনে
প্রণতি জানায়ে একান্ত মনে
বয়স্যজনে বাহুপাশে বাঁধি
বিজয়ার প্রীতি জানাল!
নিখিল ভুবনে বিধির বিধানে
আনন্দ-বেদনা চলে মিশ্রণে—
বেদনা ভুলিবে জগৎ মাতিবে
নবীন আশায় পুনঃ
অনিত্য এই মানব জীবনে
ইহাই সত্য, জেনো।

বসুন্ধরা

তপন-তনয়া তুমি, বসুমতী মাতা,
শ্যামলিমা দিয়া তোমা
সৃজেছে বিধাতা!
নদ-নদী স্রোতস্বিনী পর্বত-সাগর,
তুষার-আবৃত মেরুদেশ আর
সুবিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর—

নিবিড় অরণ্যরাজি ভরিয়াছে
তোমার অন্তর,
সকল মিলায়ে তব রূপ
কী বিচিত্র ভয়াল-সুন্দর!
মহাকাশে তব স্থান নবগ্রহ সনে
সৌরজগতে—
আবর্তন করিতেছ স্বীয় কক্ষে
দিবসে-নিশীথে।
সূর্য-পরিক্রমা করি বৎসরে বৎসরে
ষড়-ঋতুচক্র আবর্তনে—
সাজাইছ তব অঙ্গ
নানা প্রকরণে!
অনাদি সৃষ্টির কাল হতে
জন্ম দিয়া প্রাণিকুলে আপন আগ্রহে
লালন করিছ তাহাদের
তুমি মাতৃস্নেহে।
সাগর-অতলে যত প্রাণী—
মাতা তুমি, সবার জননী।
তব প্রকৃতির শান্ত আর রুদ্ররূপ মাঝে
রক্ষণ করিছ প্রতিক্ষণে জীবগণে
জননীর সাজে!
অরণ্য-গহনে শ্বাপদেরা জনপদে মানব সকল—
তোমার আশ্রয়ে আছে বাঁচি
সম্পদে-বিপদে অচঞ্চল।
যুগে যুগে তব বক্ষোপরে কত বিবর্তন
আর কত না প্রলয় সংঘটিত হইয়া
চলেছে অবিরাম—
সর্বংসহা পৃথ্বী তুমি,
নীরব নিষ্ঠায় রহিয়াছ অবিচল
সুমেরু সমান!
বিশ্বস্রষ্টা লীলায় আপন
সৃজন করেছে তোমা

অপরূপ অনুপম!
বিপুলা বসুধা, তুমি, বিচিত্র বিস্ময়-
তোমার তুলনা নাহি হয়।

চড়ুই পাখি

চড়ুই পাখির দল-
কিচির-মিচির ডেকে ডেকে
উড়ে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে
অতীব চঞ্চল—
চড়ুই পাখির দল!
গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখি ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে
করছে কোলাহল
বড়ই চঞ্চল—
চড়ুই পাখির দল!
সকাল-বিকাল দুপুরবেলা
দেখি ওদের করছে খেলা
উঠোনেতে ধুলোর 'পরে
নিয়ে দলবল
অশান্ত চঞ্চল—
চড়ুই পাখির দল।
বালির 'পরে গর্ত খোঁড়ে
বালি মেখে স্নান করে
ঠোঁটে বালি তুলে তুলে
মাখে মাথায় গায়ে
হঠাৎ কোথা উড়ে চলে যায়-
চঞ্চল ডানায়!

আমিষ আহার নেইকো তাহার
নিরামিষে রুচি,
উঠোনেতে ঘুরে ফিরে
সবাই মিলে আহার করে
কাঁকড় পাথরকুচি—
আমিষে অরুচি!
কোঠাবাড়ির ঘুলঘুলিতে
বাসা বানায় খড়কুটোতে,
মেয়ে চড়ুই সেই বাসাতে
বসে তখন ডিম পাড়তে।
ওই সময়ের তরে
চঞ্চলতা ছাড়ে—
মা হওয়ার আনন্দেতে
প্রাণখানা তার ভরে!

কেন?

কেন আমি রাতে-দিনে
ছড়া লিখি নিজ মনে
কী যে লিখি নাহি বুঝি
শুধু লিখে যাই—
কে মোরে লেখায়?
তারে আমি নাহি জানি
শুধু মনে মনে মানি
বলে যায় সে আপনি
আমি লিখে যাই—
কে মোরে লেখায়?
মনে মনে খুঁজি তারে
দিনে-রাতে অন্ধকারে

জানিতে পারি না অরে
খুঁজে মরি হায়—
কে মোরে লেখায়?
জানি না সে কোন জন
মোরে লয়ে অনুক্ষণ
খেলিছে খেলনা সম
কোথায় লুকায়ে—
সে মোরে লেখায়!
কিন্তু কেন লেখায় সে
আমার অন্তরে বসে
কী কারণে কী উদ্দেশ্যে?
ভেবে মরি তায়—
যে মোরে লেখায়!
"কেন"-র জবাব কোথা?
বুঝি না কেন সেকথা?
বুঝিবার চেষ্টা বৃথা
বুঝা নাহি যায়
কেন সে লেখায়?

কে?

কে রচেছে এ বিপুল বসুধা মহান?
কে বা সেই মহাশক্তি যাঁর সৃষ্ট
জগতের প্রাণীদের প্রাণ?
কাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়
ঘটায়?
তাঁরে মন জানিবারে চায়!
যুগ যুগ ধরে মানুষ খুঁজিছে তাঁরে—
চেতনের চেতয়িতা সেই চেতনেরে।

কেন তাঁরে জানিতে না পারে?
রয়েছেন তিনি কোথা, কত দূরে?
নিঃসীম গগনতলে নক্ষত্রের আঁখি জ্বলে—
দিবসে রবির তেজে তাহা যে মিলায়!
কে তাদের সৃজেছে হেলায়?
প্রভাত-রবির আলো জগৎ ভরায়—
রাতের আঁধারে সে আলোক
কোথায় হারায়?
কাহার ইচ্ছায়?
কে বা সেই ইচ্ছাময় পরম পুরুষ—
যাঁর ইচ্ছাক্রমে জগতের প্রাণিগণ
জন্ম আর মৃত্যুর অধীন?
কে বা সেই জন?
জানিবারে চায় তাঁরে মন।
অনাদি এ সৃষ্টির আদিতে যে মহা-ইচ্ছায়
এই মহাবিশ্বের সৃজন—
কে অথবা কিবা সেই সৃষ্টির কারণ?
খোঁজে তাঁরে মন।
দীর্ঘ তপস্যার তেজে তাঁহার কৃপায়
যদি কেহ কখনও সে-অখণ্ড চেতন মাঝে
ডুবি—আপনার সীমারে হারায়
অনুভবে এক হয়ে যায়,
অসীম সে চৈতন্য মাঝারে
যাহা আছে তাই আছে, হায়!
মুখে তাহা কহা নাহি যায়!

কোথা?

কোথা হতে আসিলাম
এই ধরা 'পরে—জননীর ক্রোড়ে?
কোথায় যাইব পুনঃ
এই দেহ ছেড়ে—মরণের পরে?
ভাবি বারে বারে।
কোথায় ছিলাম আমি জন্মের আদিতে—
ভাইবোন পিতামাতা সকলের সাথে?
তাহারা কি ছিল মোর সাথে?
কিংবা আমি ছিলাম একেলা সে জগতে?
বুঝিতে পারি না কোনও মতে।
কোথা হতে এই পৃথিবীর হইল সৃজন?
সূর্য-চন্দ্র আর গ্রহ-তারা অগণন?
নিঃসীম আকাশ তার কোথায় সীমানা?
এ চিন্তার শেষ হইবে না।
কোথা সেই জন—যাঁহার ইচ্ছায়
যত জীবগণ সহ এ মহাবিশ্বের হইল সৃজন?
কোথা গেলে যায় তাঁরে জানা?
কোথা সে ঠিকানা?
কোথা হতে চিন্তারাশি মন মাঝে ওঠে ভাসি
আকুল করিয়া ক্ষণে ক্ষণে?
কোথা হতে আসে কে তা জানে?
বিচিত্র এ চিন্তা যত ওঠে মনে অবিরত
কোথায় লইয়া যাবে মোরে এ ভাবনা?
অকূল ভাবনা মাঝে
কূল যে পাই না খুঁজে—
কূল কোথা আছে কিনা
তাহা তো জানি না!

অন্তরালোক

হৃদয়-গহনে মোর সহসা
অপূর্ব এক্ আলোকের ধারা
উদ্ভাসি উঠিল—
সে আলো পরশে প্রাণে
অনাবিল আনন্দের স্রোত
প্রবাহিল!
সে আনন্দে অবগাহি ধীরে ধীরে
রচনা করিয়া চলি কবিতার ধারা—
কত ভাব কত বাণী কাব্যরূপ লভি
প্রাণে মোর জাগাইল সাড়া!
নিত্য নব কবিতা সম্ভার
ভরি দিল অন্তর আমার—
অপার আনন্দে মাতি
লিখি কাব্য দিবারাতি
কী আনন্দ নাহি জানি
তুলনা তাহার!
সৃষ্টির আনন্দ কী যে লিখিতে লিখিতে নিজে
আজ তাহা অনুভবে পাই—
কোন সে আনন্দে মাতি
মহাবিশ্ব অধিপতি রচেছেন
এই বিশ্ব বুঝি প্রাণে তাই!
অনিত্য সংসারে অশান্তি আগারে
নিত্যসত্য আনন্দের খোঁজে ফিরে মন—
নব নব সৃষ্টির আনন্দ মাঝে
ডুবিয়া থাকিলে,
সেই অনুভূতি লাভ হবে
অনুক্ষণ!
মোর প্রতি করুণায় দিলেন যিনি আমায়
অভাবিত এই শক্তি কাব্য রচনার—
কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁর শ্রীচরণ 'পরে
নিবেদিনু প্রণাম আমার!

কী ?

কী কারণে জন্মিয়াছি এই ধরা 'পরে
মানব আকারে?
কী উদ্দেশ্য সাধনের তরে?
ভাবি বারে বারে।
কী সেই মরণ—যার হাত হতে
বাঁচিতে পারে না কোনও জন?
প্রাণ কী জিনিস—উহা আসে
কোথা হতে?
পুনরায় যায় কোথা
মরণের সাথে?
কীরূপে জানিতে পারি
এ সকল বিচিত্র কারণ?
কে মোরে জানাতে পারে—
কে বা সেই জন?
কে আছে এ জগতের সৃষ্টির পিছনে?
কোন সে অচিন্ত্য শক্তি—
কে বা তাহা জানে?
জীবের চেতনারাশি কোথা হতে
আসে ভাসি—চেতনের চেতয়িতা
কে বা সেই জন?
কীরূপে জানিব তাঁরে
অজ্ঞান তিমির-ঘোরে
ডুবিয়া আছি যে আমি ভরিয়া জীবন?
কী করিলে নিত্যসত্য সেই মহান স্রষ্টারে
পারি জানিবারে?
শুনিয়াছি যোগিগণ যোগ-সাধনায়
স্বীয় অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতি মাঝে
সে-পরম চেতনেরে যেইক্ষণে
পায়—

সেইক্ষণে সেই চেতনায় মিশি
আপনার অস্তিত্ব হারায়ে
অসীম চেতনা সনে এক হয়ে যায়!
আমার জীবনে কভু সাধনা করিয়া
সেই অনুভূতি লাভ হইবে কি, হায়?

কমলা

কমলা, কমলকলি তুমি,
জন্মিয়াছ সুদূর পল্লীর দরিদ্র কুটিরে—
কোন পুণ্যবলে কার আকর্ষণে
লভিলে সেবার অধিকার
যুগ-অবতার শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের?
বিগত জন্মের স্মৃতি নাই আজ স্মরণে তোমার—
কোন ভক্তরূপে সে জনমে তুমি কৃপাভিক্ষা
চেয়েছিলে তাঁর—সে যুগের যিনি
যুগ-অবতার!
মাতৃহারা কন্যা তোমা কিশোর বয়সে
দারিদ্র্যের দুঃখে নিরুপায় পিতা শেষে
পাঠাল নগরে কোনও বিত্তবান ঘরে
শ্রমদানে উপার্জন তরে।
দৈবের নির্দেশে আসিয়া বিদেশে
অভাবিত যোগাযোগ ঘটিল তোমার—
অত্যাশ্চর্যরূপে আসিয়া লভিলে তুমি
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সেবা-অধিকার!
স্বহস্তে রন্ধন করি প্রতিদিন দিবসে-নিশায়
পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলে তুমি তাঁরে
জননীর প্রায়!
কত ভাগ্যবতী তুমি
ভাবি মনে তাই।

পিতৃগৃহে কন্যাসম স্নেহ
তুমি লভিলে সেথায়—
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অশেষ কৃপায়।
কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে
ভাবা নাহি যায়!
ধন্য তব পিতামাতা তোমারে পাইয়া—
নরজন্ম সার্থক তাদের
তোমা হেন কন্যা জন্ম দিয়া!
কিন্তু তুমি, কমলকলিকা,
জান না তো, হায়, কারে সেবিতেছ তুমি
জননীর প্রায়, ভুলি আপনায়?
অজানিতে কার কৃপা লভিয়াছ তুমি?
যে-কৃপার তরে যুগ যুগ ধরে
সাধনা করিছে জ্ঞানী-গুণী
কত ঋষি-মুনি?
ধন্য কন্যা, ধন্য, ধন্য তুমি!

হাট

ভারতের গ্রামে গ্রামে
আজও দেখা যায়
হাটবারে হাট বসে
নদী-কিনারায়—
কোথাও রেল স্টেশনের পারে
কোথাও গঞ্জের ধারে,
হাট বসে শুধু হাটবারে।
হাটে ঘিরি গড়ি উঠে
গ্রামের দোকান,
ময়রা ও মুদি জোলা আর জেলে

হাট-পারে সকলের স্থান—
যার যাহা প্রয়োজন
হাট মাঝে মিলিবে সন্ধান!
পশারিরা কাঁচা মাল
আনে ভারে ভারে—
বাজার ভরিয়া উঠে
নানা সম্ভারে।
জেলেরা বিবিধ মাছ
আনে ঝুরি ভরি—
কলরবে মাতি উঠে
যতেক পসারি!
গ্রামবাসী হাট হতে মাল কেনে
এক সাথে—নিত্য-দিনের প্রয়োজন
মিটায় তাহাতে।
বাজার বসে না গ্রামে
শহরের মতো
শহরে লোকের ভিড়
প্রয়োজনে অস্থির
প্রয়োজন দুইবেলা
হতেছে নিয়ত!
ব্যস্ত-জীবনের প্রয়োজনে
দুইবেলা রাতে-দিনে বাজার হইতে
মাল কিনিছে সতত!
পসারিরা সেই মতো মাল আনি
অবিরত বাজারে যোগায়—
শহরের প্রয়োজন কভু
না ফুরায়।
গ্রাম যদি থাকে দেশে
হাটও থাকিবে বেঁচে—
গ্রামবাসীদের কাছে
হাটের আদর,
প্রয়োজন মিটাইছে হাট নিরন্তর।

জীবনের প্রয়োজনে
গ্রামবাসিগণ জানে
করিতে হাটের সমাদর—
তাই গ্রামে দেখি আজও
হাটের আদর!

উষা

ধীরপদে নিঃশব্দে আসিয়া উষা
প্রবেশ মাগিল নিশীথের দ্বারে—
মৃদু করাঘাতে হানি জানাল তাহারে
সময় হয়েছে এবে তার
বিদায় নেবার।
আঁধার গগনতলে তারকার দল
তখনও মুদেনি আঁখি
আছে অচঞ্চল।
উষার প্রবেশে ধীরে মুদিলে নয়ন
জাগিবে জগৎ সনে
যত জীবগণ।
ধীরে প্রবেশিয়া নিশার আঁধার বিনাশিয়া
প্রকাশিত হল উষা
মধুর হাসিয়া!
কুসুম কোরকদল বনে-উপবনে
প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল
উষা আগমনে।
রজনীর অন্ধকারে সুপ্তিমগ্ন বিহগেরা
মাতাল ভুবন সেই ক্ষণে
আনন্দ-কূজনে।
পূরব গগনে ধীরে প্রকাশিল অরুণের আভা
বিমোহিত হইল ধরণী
হেরি সেই শোভা।

ক্রমে দেখা দিল রবি
পূরব আকাশে—
শ্যামল ধরণীতল জাগিয়া উঠিল
কিরণ পরশে।
জীব-জগতের সুপ্তি বিদূরিত করি
তপন উদিল—
নীরব ভুবন ক্রমে কলরবে
মুখর হইল।
দিবার প্রবেশে ধীরে অপসৃত হলে
উষার গুণ্ঠন
ক্ষণস্থায়ী উষা দিবার নিকট
মাগিল বিদায় সেইক্ষণ।
স্মিত হাস্যে সম্মতি জানায়ে
দিবা প্রবেশ করিল—
মধুর হাসিয়া উষা
ধীরপদে বিদায় লইল!

কবে?

কবে হয়েছিল অন্তহীন এই মহাবিশ্বের
সৃজন—মহাকাশে সৌর-জগৎ আর
নক্ষত্রের রাশি অগণন?
কবে হল জন্ম পৃথিবীর—জল-স্থল
অরণ্য-পর্বত সহ মানুষ
ও প্রাণীর?
কতযুগ ধরে মানুষেরা ছিল অসভ্য
পশুর প্রায়—অরণ্যের
নিবিড় আশ্রয়ে?

কবে কতযুগ পরে সে মানুষ আজ
উঠিয়াছে সভ্যতার
উন্নত শিখরে?
কবে ভাষা সৃষ্টি হল মানব-সমাজে
মনোভাব প্রকাশ করিতে
তারা শিখিল কীভাবে?
কবে মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তা ভগবানে
জানিবার আগ্রহ
জাগিল?
ভয়ার্ত আকুলপ্রাণে কবে তারা
ভগবানে স্মরণ করিল?
কবে কতযুগ ধরে অবিরত চেষ্টা করে
মানুষ তাহার আপন অন্তরে
পাইল খুঁজিয়া সেই অজানারে—
যে-অজানা চেতনা ও শক্তির আকারে
রহিয়াছে এ মহাবিশ্বের
অন্তরে-বাহিরে?
কবে আর কীভাবে আমার হবে
এ সকল জ্ঞান—
কে কবে জানাবে মোরে
এ সব সন্ধান?
স্বল্পস্থায়ী এ জীবনে এ সকলে জানিবার
উপায় কোথায়—
কে মোরে জানাতে পারে
সে জন কোথায়?
কোন ভাগ্যবান কবে জেনেছিল
এই সবে—সম্ভব কি হয় কারও
এই সব জানা?
এ বিস্ময় মোর কভু ফুরাবে না!

আমার মাঝে

আমার মাঝে আছ তুমি
জন্ম জন্ম ধরি—
তবু কেন পাই না তোমায়
বৃথাই খুঁজে মরি!
আমার সকল কাজে
সব ভাবনার মাঝে
চেতন-রূপে তুমিই আছ
নিত্য নব সাজে!
তোমার লাগি যে-প্রেম জাগে
আমার হৃদয় মাঝে
তোমারি প্রেম সে যে
তাহা বুঝতে পারি না যে!
যে-সুর বাজে নিত্য
আমার প্রাণের বীণার তারে—
সে সুর তোমার
তুমিই বাজাও তারে আপন সুরে।
জীবন ভরে যতেক রূপে
প্রকাশি নিজেরে—
তোমারি সে প্রকাশ,
হেরি বিস্মিত অন্তরে!
আমার "আমি" পাই না খুঁজে
হারিয়ে যাই তোমার মাঝে—
তুমি আছ আমার মাঝে
বুঝতে পারি তা যে।
আমার সকল ইচ্ছা সকল শক্তি
আমার প্রাণের সকল ভক্তি
সুপ্ত আছে তোমার ইচ্ছা মাঝে—
ইচ্ছাময়ী মাতা তুমি
তোমার হাতের খেলনা আমি
বুঝি তাহা অনুভূতির মাঝে।

জনম আমার ধন্য মানি
তোমায় লভি অন্তরে—
সকল চাওয়া সকল পাওয়া
তৃপ্ত হল মন্তরে!
তুমি আছ হৃদয় জুড়ে
আমার প্রাণের অন্তঃপুরে—
বাজাও আমার প্রাণ-বীণারে
তোমার মোহন সুরে!

ধন্য আমি

জীবন আমার ধন্য হইল
তব মঙ্গল দর্শনে—
সার্থক মোর মানব জনম
তোমার পুণ্য স্পর্শনে!
বহু জন্মের পুণ্য আলোকে
হৃদয়-দুয়ার খুলিল পলকে—
বিমোহিত প্রাণ ধন্য হইল
তোমার জ্যোতির ঝলকে!
মোর হৃদয়ের তিমির বিনাশি
ধ্রুবতারা সম প্রকাশিলে হাসি
অযাচিত তব করুণা বরষি
ধন্য করিলে আমারে!
মোর জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া
পূর্ণ হইল তোমারে লভিয়া—
ধন্য হইল জীবন আমার
অন্তরে লভি তোমারে!

সানাই

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের
শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর অনুসরণে রচিত)

শ্যামা মায়ের "জ্ঞানের অসি"
"শ্যামের হাতের মোহন বাঁশি"
নামলো ধরায় আসি—
হয়ে "সানাই বাঁশি"!

জ্ঞান-প্রেমের প্রবল বানে
কলির পাতক রাশি ক্রমে
যাবে মুছে ধরার বক্ষ হতে—
ভরবে ধরা সত্যের জ্যোতিতে!

জগন্মাতার করের সানাই
নবীন তানে বাজছে সদাই
অভিনব অভেদ মন্ত্রে
জাগাতে বিশ্বেরে—

মুগ্ধ হল জগৎবাসী
একের মন্ত্র মর্মে পশি
জমল ভিড়
সানাই বাঁশি ঘিরে!

মায়ের ছেলে সানাই বাঁশি
মায়ের কোলে থাকে বসি
হেরে মায়ের খেলা—
মহাবিশ্ব লীলা!

সত্তা-শক্তি দুয়ে মিলে
"রূপে-নামে-ভাবে" খেলে
অপূর্ব এ খেলা,
খেলেন স্বয়ং মা একেলা—
তাঁর "নিত্যাদ্বৈত" লীলা!

মাতৃবোধে আত্মহারা
"আপন বোধে" পাগলপারা
মায়ের ছেলে সানাই থাকে
মিশে মায়ের প্রাণে—

সানাই-স্নেহে ব্যাকুল মাতা
সানাই সনে "আপনতা"
"আপন বোধে" রহেন সদাই
সানাইয়ের হৃদ্‌গহনে।
চিদানন্দ স্বরূপ মাতার
মগ্ন যখন স্বরূপে তাঁর
অভেদরূপে সানাই সুখে
থাকে মায়ের বুকে!
সানাইরূপে মা-ই স্বয়ং
লীলার মাঝে ভিন্ন দু'জন—
সানাইয়ের মা, মায়ের সানাই,
এক ব্যতীত দুই কোথা নাই,
দ্বৈত কেবল "রূপে-নামে"
"ভাবে-বোধে" এক দু'জনে!

বালাপোশ

মাঘের শেষে কন্যা মোরে
দিল উপহার—
অপরূপ এক বালাপোশ
নেই তুলনা যার!
সেই বালাপোশ গায়ে দিয়ে
উষ্ণ-কোমল পরশ পেয়ে
ঘুমাই অকাতরে—
মনে জাগে বারে বারে
কন্যা যেন সোহাগ ভরে
জড়িয়ে আছে মোরে।
বালাপোশের রূপে-গুণে
মাঘের শীতও হার যে মানে,

কন্যারে মোর ভুলিব কেমনে?
যত দূরেই থাকুক না সে
মন-প্রাণ তার আমার কাছে—
স্নেহের ডোরে বাঁধা যে দু'জনে!
ভালোবাসার এই উপহার
তুলনা যে নেইকো তাহার,
নেই কোনও উপমা—
মেয়ের লাগি চিন্তা মায়ের
মায়ের তরে ভাবনা মেয়ের
ভালোবাসার নেই যে কোনও সীমা!
জীবনের এই শেষের বেলায়
মেয়ের স্নেহ প্রাণকে জুড়ায়
হেন কন্যা পেলাম আমি
বহু ভাগ্যগুণে—
এই ভাবনা জাগায় শান্তি প্রাণে!

গোলাপ

অভিজাত কুসুমের মাঝে
গোলাপের নেই যে তুলনা—
যত রূপ তত গুণ
একাধারে কোথাও মিলে না।
বিচিত্র গড়ন আর বিবিধ বরন
বাগান ভরিয়া ফোটে
অতি সুশোভন!
মধুলোভী ভ্রমর ও মৌমাছি দল
উড়িয়া উড়িয়া ফিরে
সৌরভে চঞ্চল!

সাদা-লাল-গোলাপি ও হলুদ গোলাপ
গুচ্ছ ভরি আসে বিক্রয়ের তরে—
গৃহের সজ্জায় আর প্রিয়-উপহারে
সাধারণে আনে কিনে
রুচি অনুসারে!
কণ্টকে আবৃত এই কুসুম গাছেরে
অতি সমাদরে আনি বাগান সাজায়—
অনুপম সৌরভে তাহার
প্রভাত সমীর প্রাণেরে মাতায়!
বর্ণে, গন্ধে আর রূপে পুষ্প মাঝে
গোলাপের নেই সমতুল—এ কারণে
গোলাপের ফুল জগতে অতুল!

ফালগুন

উতলা ফালগুন হাওয়া এসে
ঝরালো নিঃশেষে
বৃক্ষশিরে শুষ্ক পত্ররাশি
চক্ষের নিমেষে!
বনে-উপবনে কাননে কাননে
যত বৃক্ষরাজি—
পাতা-ধরানোর খেলা লয়ে
মাতিয়াছে আজি।
রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে বৃক্ষ যত
রহিয়াছে স্থির মৌনী সন্ন্যাসীর মত।
গৈরিক পত্রের শয্যা রচিত হয়েছে
বৃক্ষতলে—বুঝি বিশ্রাম দানিতে
শ্রান্ত-ক্লান্ত পথচারী দলে!

বিশ্বপ্রকৃতি বুঝি আপন গুণ্ঠন
করিলেন আজি উন্মোচন—
নবীন গুণ্ঠনে হয়ে সুসজ্জিত
নবরূপে করিতে নিজেরে
প্রকাশিত!
ধীরে ধীরে বৃক্ষশির যত
নবীন মঞ্জরী আর নব কিশলয় ভারে
আপনারে করিল সজ্জিত!
কোকিল কূজনে আর দোয়েলের গানে
বসন্তের আগমন ধ্বনি
জাগিয়া উঠিল বনে বনে।
রিক্ত-নিঃস্বরূপে
ফালগুন আসিয়া চুপে চুপে
ভরি দিল ধরণীরে
নব পত্র-পুষ্প ভারে
নব সুষমায়—
জরা-কবলিত শীত
ধরা হতে লইল বিদায়!

স্নেহাশিস

শ্রীহরি স্মরণ করে শুরু করি
তোমার নোতুন খাতা—
তাঁরই কথায় ভরব
তোমার খাতার প্রথম পাতা।
দুঃখে-সুখে সকল অবস্থায়
রেখো তাঁরে মনে—
জীবন যেন কাটে
তাঁরই ধ্যানে!

তিনিই সত্য তিনিই নিত্য
তিনিই সারাৎসার—
তিনি ছাড়া এ-জগৎ
অনিত্য অসার।
সংসারে মন দেবে
তাঁর চরণখানা ধরে—
শেষের দিনে তাঁর কৃপাতেই
যাবে তুমি তরে!

ভালবাসা

স্নেহময়ী কন্যা তুমি
তোমায় পেয়ে ধন্য আমি
জীবন ভরে রাখব তোমায় মনে—
জানি, তুমি শেষ অবধি
থাকবে আমার অনুরাগী,
ভালবাসার সোনার ডোরে
বাঁধা যে দু'জনে!

নবযুগ

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর অনুসরণে)

ঘনঘোর কলির পাতক বিনাশিতে
চিদানন্দ-রূপ হরি
আসিলেন অবতরি
পুনঃ ধরণীতে।

প্রেমিক বাউল বেশে বিতরিতে দেশে দেশে
বিশ্বজননীর প্রেমরাশি
অভিনব "সানাই"-এর সুরে—
জননীর শ্রীমুখের সংগীত-আকারে।
যে-ঘোর অবিদ্যা আশ্রয় করিয়া
স্বার্থমগ্ন হয়ে আছে কলিজীবগণ—
পরস্পর হিংসা-দ্বেষ হানাহানি করি
আপন অস্তিত্ব "অখণ্ড চৈতন্যসত্তারে"
বিস্মরি দুঃখ আর অশান্তি
ও বিচ্ছেদের মাঝে
কাটায় জীবন—
"সানাই"-এর সংগীতলহরী
"অভেদের মন্ত্র" উচ্চারি তাহাদের প্রাণে
যেন জাগায় চেতন।
বিশ্বের জননী নিজে মেতেছেন এই কাজে
উদ্ধারিতে আপনার "প্রকাশ সন্তানে"—
"সানাই" বাঁশরি করে ধরি
বাজাইয়া সে বাঁশরি
অভেদের চেতনা সঞ্চারি
জাগাইতে কলিজনগণে।
নিঃসীম অখণ্ড যে-মহাচৈতন্য
সকল জীবন মাঝে পরিব্যাপ্ত আছে—
অবিদ্যা-মায়ার ঘোরে সমাচ্ছন্ন
কলিজীব আপনার সে স্বরূপ
বিস্মৃত হয়েছে।
বাউলের বেশধারী "সানাই" বাঁশরি
নিত্যাদ্বৈতের মন্ত্র শ্রীমুখে উচ্চারি
জাগাবেন মোহগ্রস্ত যত সন্তানেরে
কলিশেষে নবযুগ সূচনার তরে।
মায়ের মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ করি
আসিছে ধরায় নবযুগ—
জীবরূপ তাঁর যত সন্তান-হৃদয়ে

সত্যের চেতনা জাগ্রত হইয়া
প্রকাশিত হতেছে এবার
সত্যযুগ!

রথযাত্রা

রথারূঢ় জগন্নাথে দর্শন করিতে
যে বা পারে—দুঃখময় এ সংসারে
পুনঃ আসিতে হয় না তারে ফিরে!
এ বিশ্বাস অন্তরে বহিয়া বৎসরে বৎসরে
শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথে দর্শনের তরে
বাল-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে
সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ
পুণ্যার্থীরা আসে।
জগন্নাথে দর্শনের পরে
সুপবিত্র রথরজ্জু স্পর্শ করি
পরিতৃপ্ত মনে যান তাঁরা ফিরি।
কোন রথে সমারূঢ় হয়ে
যান জগন্নাথ? কারে সবে
করে প্রণিপাত?
দেহ-রথে সমারূঢ় মানব অন্তরে
পরমাত্মা যিনি—
তাঁহারেই জগতের নাথ বলি
কহে জ্ঞানী-গুণী।
এ জীবনে চারিবার শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথে
দরশন হয়েছে আমার—
কিন্তু নাহি জানি মোর হৃদয়-মাঝার
কত জন্ম পরে আমি দরশন
লভিব তাঁহার।

তাঁর কৃপা তরে কাতর অন্তরে
স্মরণ করিয়া যাব তাঁরে আমরণ—
শরণাগতের পরে যবে তিনি
কৃপা করে দিবেন আমারে দরশন
সেইক্ষণে পূর্ণ হবে মোর এ জীবন।

জগৎগুরু

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

যে মহাচৈতন্য-বক্ষে মহাবিশ্ব জাত ও বিধৃত—
তিনিই ভক্তের চিত্তে শ্রীগুরুর রূপে
হন প্রকাশিত!
ভিন্ন রূপে-নামে দেখি যত গুরুগণে
সবার অন্তরে সেই একই
গুরুশক্তির প্রকাশ—
অখণ্ড একক চৈতন্যসত্তার
খণ্ড হইবার নাই কোথা
কোনও অবকাশ!
গুরুদত্ত বিভিন্ন ভক্তের বিবিধ মন্ত্রের উচ্চারণে
অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদিত হয়
অখণ্ড-গুরুর শ্রীচরণে—
ভক্ত-মানসের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে!
সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ গুরুর স্বরূপ—
দুঃখ-বিপদের মাঝে গুরুর স্মরণে
জননীর স্নেহে গুরু রক্ষা করিবেন
তাঁর "প্রকাশ-সন্তানে"।
গুরুমন্ত্রে একান্ত বিশ্বাস
সর্ববাধা-বিপদের ঘটায় বিনাশ!

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আর পরব্রহ্ম নিজে
চতুর্বিধ গুরুমূর্তি রূপে
সকলের হৃদয়ে বিরাজে।
শ্রীগুরুর স্মরণে-মননে-ধ্যানে
সুপ্ত সেই বোধের বিকাশ
হয় ভক্তমনে।
গুরুপদে আত্ম-সমর্পণ করে যেই জন—
শরণাগত সে ভক্তের
বোধরূপী সদ্‌গুরু করেন অচিরে
ভব-বন্ধন মোচন।

পরিচয়

জন্ম-মৃত্যু চক্র আবর্তনে এই মানব জীবন—
এ জীবনে যত বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজন
পরিচিত হয় একের জীবনে,
পরজন্মে তাহাদের আর
সে না চিনে।
মনুষ্য জীবনে রূপ-নামধারী দেহের মাধ্যমে
ঘটে পরস্পরে এই পরিচয়—
দেহের বিনাশে এই পরিচয়
চিরদিন তরে লুপ্ত হয়।
অবিনাশী যেই পরমাত্মা মানবের সত্য পরিচয়—
মরণের পরে রূপ-নামহীন জীবাত্মারে
চেনা মানুষের কভু সাধ্য নাহি হয়।
পিতামাতা আপন সন্তানে সেবাযত্ন করে
প্রাণপণে—পরজন্মে সে সন্তানে
ভিন্ন দেহে ভিন্ন নামে
দেখিলেও কভু নাহি চিনে।

মানুষের দেহ যেন জীবাত্মার ভিন্ন ভিন্ন
পোশাকের মতো—জন্মে জন্মে যার
পরিবর্তনের সাথে লুপ্ত হয়
পূর্ব পূর্ব জনমের পরিচয় যত।
অনিত্য এ সংসার-জীবনে দেহী-মানবের
পরিচয় শুধু বর্তমান দেহটিরে ঘিরে—
পরজন্মে দেহ পরিবর্তনের সনে
একান্ত সে পরিচয়
যায় মুছি চিরকাল তরে!

বসন্ত

উতলা ফাল্‌গুন সনে নবপত্র-পুষ্প ভারে
সুসজ্জিত হয়ে আসিল ধরায় ঋতুরাজ-
জরাগ্রস্ত শীতের বিদায়-লগ্ন
বিঘোষিত করি ধরামাঝ!
উদাসী বাতাসে বনে বনে
পাপিয়ার গানে ক্ষণে ক্ষণে
আনন্দমুখর হল ধরা—
অরণ্যে প্রান্তরে গিরি-নির্ঝরে
নব অতিথির আগমন
জাগাইল সাড়া!
বৃক্ষশিরে নব কিশলয় অপরূপ শোভা
বিস্তারিল—বনবীথি নবপুষ্প সাজে
সজ্জিতা হইয়া ঋতুরাজে
স্বাগত জানাল।
আনন্দ-চঞ্চল ধরাবাসী ফাগের উৎসবে মাতি
রাঙাইল ধরণীরে আবিরে কুঙ্কুমে
প্রাণের আনন্দে মুখর করিল ধরা

ক্ষণে ক্ষণে উৎসবের. গানে!
জগতের কল্যাণের তরে ষড়ঋতু আসে ধরা 'পরে
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ ও হেমন্তের শেষে
দুঃখকর শীতঋতু আসে অবশেষে।
শীতের কষ্টের অবসানে বসন্ত জাগায় প্রাণে
নবীন আনন্দ-শিহরন
তাই ঋতুরাজ বসন্তেরে
স্বাগত জানায় বিশ্বজন!

পূর্ণিমা

ঘনঘোর অমানিশা অবসান হলে
পশ্চিম গগনভালে দেখা দেয়
দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশিলেখা—
উজ্জ্বল কিরণে যেন আঁকা!
প্রতি রজনীতে দেখা যায় তারে
এক এক কলা করি বাড়িতেছে ধীরে।
যতই আকার বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে
পুবের আকাশ পানে পিছাইয়া
যায় ক্রমে ক্রমে।
অবশেষে চতুর্দশ দিবা অবসানে
পঞ্চদশ দিনে সন্ধ্যার লগনে
সেই পূর্ণচাঁদে হেরি জাগে মনে
অপার বিস্ময়—
রৌপ্যময় থালাখানি বুঝি উজ্জ্বল
বিভায় পুবের গগন আলো করি রয়!
পূর্ণিমা নিশার রূপ ধরণীরে পরিণত করে
স্বপ্নলোকে—এ ধরণী মিথ্যা
হেন ভ্রম আনে জগতের চোখে।

মোহময়ী পূর্ণিমা রজনী
জাগায় সবার প্রাণে আনন্দের সাড়া—
সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি মাঝে
প্রাণমন হয়ে যায় হারা!

তোমার স্মরণে

তুমি মোর জীবনের কর্ণধার—
তোমার স্মরণে মনে জাগে
আনন্দ অপার!
সংসারের শতকাজে দুঃখ-বেদনার মাঝে
হারাইয়া নিজে যবে ভুলি তোমা—
ওগো কর্ণধার, দয়াময় প্রভু,
আমারে করিও তুমি ক্ষমা!
কৃপা করি, নাথ, আমার মাঝারে
প্রকাশিত করো তোমা।
মোর এ জীবন রবে যতক্ষণ ভুলিতে দিওনা
তোমারে কখনও—প্রতিশ্বাসে তোমা
করিতে স্মরণ শকতি দানিও আমারে।
অনিত্য সংসারে মোহের আগারে
রাখিও না মোরে চিরদিন ধরে—
নিত্যসত্য জীবন-সারথি,
তুলি নিও তুমি আমারে!
সুদিনে-দুর্দিনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
আশা-নিরাশায় আনন্দে-বেদনে
শান্তি লভিতে পারি যেন
তব স্মরণে!
জীবনে-মরণে জনমে-জনমে
পারি যেন তোমা রাখিতে স্মরণে

ব্যর্থ জীবন তোমার বিহনে
ঠাঁই দিও তব চরণে।
চিরদিন আমি পারি যেন, প্রভু,
রাখিতে তোমারে স্মরণে!

মুক্তি ও শান্তি

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

এ জগতে প্রতিটি জীবের জীবনেতে
আকৃতি-প্রকৃতিগত যে পার্থক্য আছে,
তার সনে ঐক্য আর সাদৃশ্যের ভাবও
নিহিত রয়েছে।
আভ্যন্তরীণ এই ঐক্য ও সাদৃশ্য
ব্যবহারগত পার্থক্যের মাঝে
সীমিত না-রাখি
সকল জীবের মাঝে ঐক্য কিংবা
একাত্মবোধের দর্শন লভিতে
পারা যায়—
অন্তরদৃষ্টির সুদীপ্ত জ্যোতিতে
ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিষ্ঠায়!
এই নিত্য-সমান ও নিত্য-ঐক্য সম্বন্ধের
অনুভূতি আপন অন্তর তলে
জাগিবে যাহার—
সুনিশ্চিত মুক্তি আর শান্তি লাভ
হইবে তাহার!
আত্ম-সমীক্ষার এ মহৎ চেষ্টা
অভ্যাসের ফলে—খণ্ড ও ভেদের মাঝে
অখণ্ড ও অভেদের দর্শন লভিতে

পারে যেই জন,
এ জনমে হইবে তাহার
নিত্যসত্য ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম দরশন!

নামের মহিমা

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

এই মহাবিশ্বে অন্তরে বাহিরে পরমাত্মারূপে
ব্যাপ্ত রহিয়াছে যাহা—তাহা শুধু নাম!
মহাশূন্যে নিরন্তর ধ্বনিত হইছে
এই নাম—কোথায় তাহার উৎস
কেহ তার না পায় সন্ধান!
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হইয়া আছে
শুধু এই নামে—নাম ব্যতিরেকে
রূপহীন পরম-আত্মারে ধরা
সাধ্য নাহি হয় কভু মানব জীবনে।
নাম উচ্চারণে চিত্তাকাশে সৃষ্টি হয়
যেই তরঙ্গের—সে তরঙ্গ সনে
মন যুক্ত হলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি
হবে মানবের।
যত নাম আছে এ জগতে সব নাম
একই সমান—নামের অভাবে
নিত্যসিদ্ধ মাতৃনাম জপিতে হইবে
অবিরাম।
পিতা-মাতা এই দুই নিত্যসিদ্ধ নামে
জাগ্রত করার নাই কোনও প্রয়োজন—
মাতা ও প্রণব কিংবা প্রণব ও ইষ্টমন্ত্র
নিত্যকাল একই সমান।

যেই নাম সেই নামী অভিন্ন দু'জনে—
নামের আশ্রয়ে নামী মিলে ভক্তপ্রাণে।
সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ—
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনের মিলনে
ধরে এই পরব্রহ্মরূপ।
একনিষ্ঠ মনে নামের সাধনে
অন্তর মাঝারে হয় ইষ্ট-জাগরণ,
পরব্রহ্ম ইষ্টের মিলনে
ধন্য হয় মানব জীবন!

প্রভাত

নিশা অবসানে পুরব গগনে
অরুণের রাগ প্রকাশিল ক্রমে
সুপ্তি মগন ভুবন জাগিল
বিহগের গানে গানে!
কুসুম কোরক উঠিল ফুটিয়া
প্রভাত সমীর পরশ লভিয়া—
মৃদু গুঞ্জনে উড়িল ভ্রমর
মধু সৌরভে মোহিয়া!
ধীরে দেখা দিল রক্তিম রবি
আকাশের সীমানায়—
আলোর বন্যা ভাসাল ভুবন
জগৎ জাগিল তায়!
নীরব ধরণী সরব হইল
প্রভাতের আগমনে—
সুপ্তিমগন জগজনগণ
চেতনা লভিল ক্রমে

দিবা অবসানে নিশা আগমনে
জগৎ বিরাম পায়—
সুপ্তির মাঝে ক্লান্তি নাশিয়া
জাগে নব চেতনায়!

প্রজাপতি

বিশ্বপিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃজন
অপরূপ রূপময় প্রজাপতিগণ—
রূপের পশরা লয়ে ফিরে
বন হতে বন!
চঞ্চল পাখায় উড়ি উড়ি
ফুলে ফুলে বসে অকারণ—
বিচিত্র পুষ্পের সনে মিশি
বিভ্রান্ত করিয়া তোলে
মানব নয়ন!
ফুল আর প্রজাপতি বিধাতার
অপূর্ব সৃজন—
এ জগতে যত রূপ আছে
সবরূপ মাঝে অনুপম!
পরমপিতার স্নেহ লাভ
প্রজাপতির গৌরব—
সে গৌরবে মাতি ফুলবনে
চঞ্চল হইয়া ফিরে
প্রজাপতি সব!

ঈশ্বর

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

এই মহাবিশ্বে যত বস্তু রহিয়াছে
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণী কিংবা জড়
সবার মাঝারে এক ঈশ্বরই
আছেন বিদ্যমান—
পরম আশ্চর্য এই
সাধারণে সেই ঈশ্বরেরে খুঁজি
নাহি পায় তাঁহার সন্ধান!
বিশ্বব্যাপী যেই অখণ্ড চৈতন্যসত্তা
বিরাজিত রহিয়াছে অন্তরে-বাহিরে
জগতের সর্ববস্তু তাঁহারই
প্রকাশ-রূপ—এই মহাসত্য
সাধারণে বুঝিতে না পারে।
ঈশ্বরে জানিতে যার মনপ্রাণ
হয়েছে ব্যাকুল—দিবানিশি
স্মরিছে তাঁহারে আকুল অন্তরে
অবিরাম তাঁর স্মরণে-মননে-ধ্যানে
চিত্তশুদ্ধ হইবে তাহার
ধীরে ধীরে।
সেই শুদ্ধচিত্তে প্রতিটি বস্তুর মাঝে
ভগবৎ-অনুভূতি লভি আপনার সনে
তাহাদের অভিন্নতা অনুভব হবে—
অখণ্ড একক পরমাত্মা সনে
সর্ব ব্যষ্টি আত্মা অভিন্ন জানিবে।
মানব-জন্মের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা
এ মহান আত্ম-অনুভূতি—
মনুষ্যজাতির সর্বোত্তম আবিষ্কার
ঈশ্বরের এই স্বরূপ-বিভূতি!

টগর ফুল

শুভ্রবর্ণা টগর কুসুম
রূপের গরবে নহে গরবিনী
ভক্তিনম্র চিত্ত তার
ভগবৎ করুণাপ্রার্থিনী!
শ্যামল-চিক্কণ তরুশিরে
শ্বেতদল মেলি চাহে তরুণ রবিরে—
যার স্নিগ্ধ কিরণ পরশে
ফুটিয়া উঠিবে ধীরে ধীরে!
অরুণ উদয়ে বিহগ-কূজনে
চেতন পাইয়া জাগে নিখিল ভুবন—
প্রতীক্ষা নিরত রহে বিনম্র টগর
পরশিতে দেবতা-চরণ!
বিবিধ বরনে সাজি কাননের যত পুষ্প
বিমোহিত করিতেছে মানব-নয়ন—
তাহাদের মাঝে বৈধব্যের সাজে
সজ্জিতা রয়েছে শুধু টগর কুসুম।
আত্মমগ্না রূপে দীনা টগরের ফুল
দেবতার চরণ-স্মরণে—
ভক্তিমতী গৃহবধূ পরম আদরে তুলি
সে টগর ফুলে নিবেদিল দেবতা-চরণে,
সার্থক করিল টগর কুসুমে!

প্রাণের পূজা

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

প্রাণের তরে প্রাণের সর্বত্যাগ যদি সম্ভবে
পূর্ণ প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় তবে।
প্রাণের সত্যমূল্যবোধ যেখানে—
নবযুগের সূচনা সেইখানে।
প্রাণের তরে প্রাণের দ্বারা প্রাণেতে প্রাণের স্থিতি-
ইহাই হল প্রাণ-প্রতিষ্ঠা
ইহাই সত্যস্থিতি—
ইহাই মুকতি!
বস্তু ছাড়ি প্রাণের প্রতি আগ্রহ বাড়িলে
প্রাণের পূর্ণ পরিচয় যে মিলে।
শিববোধে জীবেরে সেবিলে
প্রাণের সত্য মর্যাদাবোধ
ঘটিবে সেই কালে!
অন্তরে এই নবচেতনা জাগ্রত হইলে
নবীন আলোর স্ফুরণ-মাঝে
নবযুগের প্রকাশ হবে
মানব সমাজে!
প্রাণের শ্রেষ্ঠ পূজা হেরি আত্মহারা প্রেমে—
সত্যযুগের সূচনা এই
প্রাণের পূজার টানে!

খরা

জ্যৈষ্ঠের প্রথমে দারুণ খরার আক্রমণে
বিধ্বস্ত হইল নগরের অধিবাসিগণ—
খরার ভীষণতম রূপ হেরি ত্রাসিত হইল
ধনী ও নির্ধন নির্বিশেষে যত জনগণ।
জীবনের নিত্য প্রযোজনে জীবিকা অর্জনে
গৃহের বাহিরে খর রৌদ্রতাপে
প্রত্যেকেরে হয় বাহিরিতে—
নিরুপায় জনগণ সাধ্যমতো সাবধানে
গৃহ হতে বাহিরিছে ভীতত্রস্ত চিতে।
রিক্ত-নিঃস্ব যে-সকল নগর-পথের অধিবাসী
দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে
দিশাহারা শিশুসহ নরনারী যত
খুঁজিছে আশ্রয়—
উপযুক্ত আশ্রয়-অভাবে নিরুপায় কত প্রাণ
হতেছে বিনষ্ট তার হিসাব না হয়।
প্রকৃতির রুদ্ররূপ মানবজীবনে
অভিশাপ আনে—
খরা ও প্লাবন, ঝঞ্ঝাবায়ু আর ভূকম্পন,
অগ্ন্যুৎপাত আদি
বিশ্ববাসী বিধাতার রোষ
বলি মানে।
এ জগৎ জুড়ি ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ
সম্পদ-বিপদ আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশার
রূপ সমভাবে বিরাজিত আছে—
দ্বিবিধ রূপের সংমিশ্রণে বিধাতার সৃষ্ট
এ জগৎ "দুনিয়া" নামটি তাই
বহন করিছে।

("দুনিয়া" = "দুই নিয়া"—শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরেব ব্যাখ্যা)

বর্ষণ

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে দারুণ খরার পরে
বিধাতার আশীর্বাদ সম
নামিল বর্ষণ—
পরিতৃপ্ত হল জনগণ!
বর্ষণের বারিধারা ভাসাল ভুবন—
তৃণলতা বৃক্ষ-আদি আকণ্ঠ সলিলে নাহি
শান্তি আর তৃপ্তি লভি
আনন্দ মগন!
নদনদী স্রোতস্বিনী বর্ষণ ধারায়
পুষ্ট হয়ে ধরা 'পরে আনিল প্লাবন—
পশুপক্ষী যত প্রাণিগণ
ক্ষরাতপ্ত দেহে ধারাস্নানে
পাইল জীবন!
দুঃখ অবসানে সুখ করে আগমন
বিধাতার ইহাই নিয়ম—
নিরাশার শেষে আশা
আনে দেহে নূতন জীবন।
দুঃসহ শীতের শেষে বসন্তের আগমন—
আনন্দের শিহরনে
মাতায় ভুবন!
দুঃখ কিংবা সুখ চিরস্থায়ী নহে
ধরা 'পরে—ভাল-মন্দ আনন্দ-বেদনা
সম্পদ-বিপদ আদি আবর্তন করে
চক্রাকারে চিরদিন ধরে।
অবিমিশ্র কোনও কিছু হয় না কখনও—
সর্ব অবস্থার মাঝে থাকিবে মিশ্রণ
ইহাই জীবন,
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে
ইহাই নিয়ম!

শূন্য শয্যা

বড় আদরের মেজদিদি তুমি,
গেলে চলি একাকিনী আমাদের ছাড়ি
সুদূর নক্ষত্রলোকে দৈবের নির্দেশে
রহিল পড়িয়া তব শূন্য শয্যাখানি
বিদায়ের শেষে!
আশৈশব ছিলে তুমি আমাদের
খেলার সঙ্গিনী—মোরা সব ভাই বোনে মিলি
খেলিয়াছি কত খেলা হিসাব না জানি!
সে সকল দিনের স্মরণে
রোধিতে পারি না আজ অশ্রুধারা
নয়নের কোণে—
তোমার বিহনে।
খেলা-ধুলা লেখা-পড়া ঝগড়া ও
মারামারি করে—কেটেছে কত না
দিন শৈশবে-কৈশোরে!
তবু প্রাণে-প্রাণে ছিল কত ভালবাসা
প্রকাশের নাই কোনও ভাষা!
বার্ধক্যের দুয়ারে আসিয়া দেহের বিকারে
হয়ে গেলে শয্যাশায়ী
দীর্ঘদিন ধরে—
বহু চিকিৎসায় রোগমুক্তি
হইল না, হায়।
শেষের সে দিনগুলি জাগিছে চিত্তায়—
কাতরে স্মরেছ তুমি শ্রীদুর্গা মাতায়।
শয্যাগত শীর্ণদেহে পাণ্ডুর আননে
চেয়েছ করুণভাবে আমাদের পানে।
আজ তুমি নাই—
শূন্য শয্যাখানি রয়েছে পড়িয়া
তব স্মৃতি বহন করিয়া
তোমারে স্মরিয়া প্রাণ
উঠিছে কাঁদিয়া।

তোমার আত্মার শান্তি তরে
আজ শুধু প্রার্থনা জানাই দেবতারে
একান্ত অন্তরে—
কৃপা করি দেন যেন তিনি
মুক্ত করি তোমার আত্মারে।

আশ্বাস

শ্রীশ্রীমা আমার,
এ জীবনে আরবার লভিব তোমার
পুণ্য-দরশন—
এ আশ্বাসে পূর্ণ হয়ে আছে
মোর মন।
জানি না কখন আসিবে সে শুভক্ষণ
পাইব তোমার পূত চরণ-স্পর্শন!
আশায় আনন্দে বহি যায় মোর দিন—
প্রতিটি প্রভাত আসে হইয়া নবীন।
পরম আশ্বাস লভিয়াছি তব
শ্রীমুখ হইতে—সে আনন্দে সারাক্ষণ
প্রাণ মোর রহিয়াছে মেতে।
কী কহিব কী শুনিব তব শ্রীমুখ হইতে
নাহি জানি—অন্তরে গাঁথিয়া লব
সেই আপ্তবাণী।
স্মরণে-মননে তব প্রতিটি কথারে
রেখেছি গাঁথিয়া আমি
অন্তর গভীরে!
মাগো, তোমারে ও শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরে
সশক্তিক পরব্রহ্ম জ্ঞানে
মোরা করেছি গ্রহণ

সফল হয়েছে আমাদের কোটি কোটি
জনমের জীব[illegible]দেহের ধারণ।
জন্মান্তরে যেন মোরা তোমার করুণা
লাভে বঞ্চিত না হই—
কায়মনে এ প্রার্থনা
তোমারে জানাই!

মৃত্যু

জীবদেহখানি লয়ে জন্মি প্রাণিগণ
এই মাটির ধরার 'পরে আসে—
নির্দিষ্ট সময়কাল দেহের মাধ্যমে
আনন্দ-বেদনা ভাল-মন্দ
রোগ-শোক শান্তি ও অশান্তি
ভোগ শেষে
মৃত্যু আসি সেই জীবদেহখানি গ্রাসে!
দেহের বিকারে নাহি ঘটে অবিনাশী
প্রাণের বিকার—নবদেহ লয়ে নবীন হইয়া
সেই প্রাণ ধরা 'পরে জন্মায় আবার।
দেহ-ভোগ শেষ হলে পুনঃ
একই রূপে মৃত্যু মাঝে
দেহনাশ হয়ে যায় তার।
জীবদেহখানি প্রাণের "পোশাক"
বলি মানি—প্রতি জন্মে নব নব
দেহ লয়ে আসে প্রাণ
নব নব বেশে—
মৃত্যু-মাঝে "দেহরূপ পোশাক" তাহার
ধরার ধুলায় যায় মিশে!
"মহাপ্রাণ"-চৈতন্য সাগরে প্রাণিগণ
যেন বুদ্বুদের প্রায়—ওঠে ভাসে

ক্ষণিকের তরে,
পুনরায় সেই প্রাণ সাগরে মিলায়।
জন্ম ও মরণ অভিন্ন দু'জন—
চিরস্থায়ী নহে কোনও প্রাণ এ ধরায়,
প্রতি জীবনের দুই ভিন্ন প্রান্তে
দুই জন থাকে প্রতীক্ষায়!
জীবনের কাল পূর্ণ হলে
মৃত্যু আসি জীবনেরে নাশে—মরণের পরে
নবজন্ম লয়ে সেই প্রাণ পুনঃ
ফিরে আসে।
এইরূপ জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে
আবর্তন করে ধরা 'পরে।
অনিত্য জগৎ মাঝে নিত্য কিছু নাই—
বিধাতার অমোঘ বিধানে সৃষ্টি ও বিনাশ
চক্রাকারে আবর্তন করিছে সদাই।
আসা আর যাওয়া—এই দুই
নিত্যসত্য লয়ে জগৎ সৃজন—
সে কারণে এ জগৎ "দুনিয়া" নামটি
করিছে বহন।

(দুই বিপরীতের মিশ্রণে সৃষ্ট—দুই নিয়া="দুনিয়া"—শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ব্যাখ্যায়)

ভজন

মানব জন্মের সার্থকতা
একমাত্র ভগবান লাভে—
সেই ভগবানে বিস্মৃত মানব
অনিত্য সংসারে থাকে ডুবে!
শুদ্ধচিত্তে সরল অন্তরে
ইষ্টনামের ভজনে—

সংসারীগণের জীবনেতে
সার্থকতা আনে!
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একযোগে
পারমাত্মারূপে জাগ্রত হবেন
ভক্ত-হৃদয়ের তলে—
নিত্য ভজনের কালে!
ভজন-পূজন আর স্মরণ-মনন
ভক্তেরে করিবে ভগবানের আপন।
অবিরাম ইষ্টনাম ভজে যেই জন—
অন্তর মাঝারে পায় ইষ্ট-দরশন।
ইষ্ট-দরশনে ভক্ত হয় আত্মহারা—
সংসার তাহার কাছে যেন রুদ্ধ কারা।
সংসার-আসক্তি মন হতে মুছি যায়—
দেহমুক্তি ঘটে তার ইষ্টের কৃপায়!

ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

মানবহৃদয়ে মায়া-মহামায়া
আর যোগমায়া রূপে তিন স্তরে
এক চৈতন্যশক্তিই বিরাজিছে—
দেহেন্দ্রিয়ে মায়া অন্তর-মনেতে মহামায়া
আর হৃদয়কেন্দ্রের বোধে
যোগমায়া রহিয়াছে।
জীবন-মধ্যাহ্নে "আমার আমি"-তে
দেহের মাধ্যমে হয়
মায়ার প্রকাশ—
জীবনের অপরাহ্নে "তোমার আমি"-তে
ধর্মজীবনারম্ভে হয় মহামায়ার বিকাশ।

জীবন-সায়াহ্নে "আমি আমার"-এর
শুদ্ধবোধে হৃদয়-কেন্দ্রেতে
যোগমায়া শক্তি প্রকাশিত হয়—
মায়া-মহামায়া আর যোগমায়া শক্তিত্রয়
একযোগে "আমির আমি বোধে"
অনন্ত শক্তি ও সত্তা মাঝে বিলীন হইয়া
তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
সর্বশেষ এই স্তরে "আমার-তোমার"
কিংবা "আমি-তুমি" আদি বোধ
বিলুপ্ত হইবে—
শুধু অস্তি মাত্র এই প্রশান্ত অবস্থা মাঝে
সর্ববোধ মিলাইয়া যাবে!

মাতৃমহিমা

জীবদেহখানি যন্ত্রমাত্র জানি—
এই দেহযন্ত্রের মাঝারে
মহাপ্রাণ-স্বরূপিণী জগৎ-জননী
প্রকাশ করেন নিত্য
আপন ইচ্ছারে!
অজ্ঞান মানব "আমি ও আমার"
এই ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইয়া
সংসারের যত কর্ম করে—
মায়ের মহিমা তারা
বুঝিতে না পারে।
তাহাদের এ ধারণা তাহাও কেবল
মায়ের ইচ্ছায়—অন্যথায় কর্তব্যের
অবহেলা হইত ধরায়।
এ জগৎ ভরি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তুচ্ছ ও মহৎ
মানুষের যত সৃষ্টি যত আবিষ্কারে—

চিদানন্দ-স্বরূপিণী বিশ্বের জননী
প্রকাশ করেন সদা আপন ইচ্ছারে।
এ বিপুল বিশ্বপ্রকৃতি আর জীবজগতের
সৃষ্টি ও বিনাশ—সর্বত্রই ঘটিতেছে
"ব্রহ্মহৃদিবিলাসিনী জননী"-র
ইচ্ছার প্রকাশ।
মায়ের ইচ্ছার রূপ এ ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ—
কোটি কোটি নক্ষত্র-জগৎ লয়ে নিঃসীম
আকাশ অরণ্য-পর্বত মেরু-মরু সহ
বিরাট এ বসুন্ধরা হয়েছে প্রকাশ।
লীলাময়ী বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বের জননী
আপনার অপার লীলায়—
সৃজন, পালন আর বিনাশ খেলায়
রয়েছেন মগ্ন হয়ে
আপন ইচ্ছায়!

ঋণ-পরিশোধ

রাধা-কানু এক তনু
বিগলিত প্রেমের ধারায়—
অবতরি এল নদীয়ায়
কলির পাতকরাশি
নিঃশেষ হইল ভাসি
প্রেমের বন্যায়!
প্রেমের প্লাবন
জগৎবাসীরে দিল
নূতন জীবন—
প্রেমস্রোতে অবগাহি
ধন্য হল
কলি-জনগণ।

শেষের দিনটি

স্নেহময়ী বড়দিদি মোর,
গেলে চলি নিত্যধামে দৈবের নির্দেশে
আজি দ্বিপ্রহরে—
রাখি গেলে শুধু স্মৃতিখানি
আমাদের তরে।
দীর্ঘদিন রোগের যাতনা ভোগ করি
শীর্ণদেহ পাণ্ডুর আনন
মিশি ছিলে শয্যা সনে—
অবশেষে আজি লভিলে জীবন মুক্তি
সকল বেদনা অবসানে!
আশৈশব মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছিলে
আমাদের সব ভাইবোনে—
লেখাপড়া খেলাধুলা সকল সময়ে
আমাদের 'পরে দৃষ্টি রাখিতে যতনে।
ঘনঘোর বাদলের দিনে
আমাদের সকলেরে ডাকি এক সনে
সযতনে শোয়াইতে শয্যার উপরে—
শোনাইতে কত গল্প কত রূপকথা
আনন্দিত মনে!
মায়ের অধিক স্নেহ পাইয়াছি মোরা
তোমা হতে—সেই সব দিনে
পারি না ভুলিতে কোনও মতে।
আজি হতে আর ডাকিতে পাব না
তোমা "বড়দিদি" বলি—
এই ভাবনায় প্রাণ উঠিছে আকুলি।
বড়দিগো, আজ তুমি নাই—
সারা বিশ্ব খুঁজি পাব না তোমারে
কোনও ঠাঁই।
জগৎ ছাড়িয়া তুমি আজ গেছ
ঊর্ধ্বলোকে নক্ষত্র-জগতে—

চাহিছ মোদের পানে সস্নেহ নয়নে
সে জগৎ হতে!
আজি হতে কাটিবে মোদের দিনগুলি
তোমার স্মরণে—তোমারে দেখিতে পাব
পুরানো দিনের স্মৃতি-রোমন্থনে!
স্মরণ-মন্দিরে নিত্য পূজিত তোমারে
প্রেমের কুসুমগুলি দিয়া—
তোমার স্মরণে পূর্ণ রবে
আমাদের হিয়া।
বিধাতারে যুক্ত করে জানাই মিনতি—
তোমার আত্মার যেন
করেন সদ্‌গতি!

তাই-তাই-তাই

"তাই তাই তাই—মামার বাড়ি যাই"
মামাদের ওই গ্রামের বাড়ির
তুলনা যে নাই!
তাই তাই তাই!
নদীর বুকে নৌকো চেপে
মায়ের সাথে যাই—
নৌকো থেকে নেমে একটুও না-থেমে
মেঠোপথে আনন্দেতে চলেছি সবাই,
তাই তাই তাই!
ঘণ্টা দু'য়েক পরে এলাম মামার ঘরে
মামী-মামা আদর করে
কোলে তোলেন তাই—
মামাদের সেই গ্রামের বাড়ির
তুলনা যে নাই।

পাথর বাটি ভরে দুধ-খৈ আর চিঁড়ে
মেখে নলেন গুড়ে মহানন্দে খাই।
বুধি গাইয়ের মিষ্টি দুধের
তুলনা যে নাই—
তাই তাই তাই!
দুপুর বেলায় কাঁসার থালায়
মেঝেয় বসে খাই—
রাঙা চালের ভাতের সনে
পুকুর থেকে ধরে এনে
টাট্‌কা মাছের মধুর স্বাদের
তুলনা না পাই!
তাই তাই তাই।
মামার বাড়ির মজার কথা
বলবো কাকে বুঝবে কে তা
সেই আনন্দের ছিঁটে-ফোঁটা
পায়নি যারা ভাই—
কী যে মজা মামার বাড়ি
ভেবে নাহি পাই!
তাই তাই তাই!

পৌলোমী

ছোট্ট আমার নাতনি সে যে
পৌলোমী তার নাম—
দেখলে তারে আনন্দেতে
নেচে ওঠে প্রাণ!
বয়সটি তার ছয় কিন্তু মনে হয়
অনেক বেশি বয়স বুঝি তার-
পাকা কথায় বুড়োদেরও

মানিয়ে দেবে হার!
যেদিন সে না আসে চক্ষু জলে ভাসে
কারণ খুঁজে অশান্ত হই
ভাবি বসে বসে—
অকল্যাণের আশঙ্কাতে
কাঁপে যে প্রাণ ত্রাসে।
পৌলোমী তার আঁকার খাতায়
মোমের চকে এঁকে ভরায়
হরেক রকম ছবি—
একদিন সে ভালোবেসে এনে দিল
আমায় এসে নিজের আঁকা ছবি।
ঘুড়ি হাতে একটি ছেলে
ছুটছে মাঠে হেলেদুলে
উড়ছে ঘুড়ি হাওয়ার টানে।
দেখে ভাবি অবাক মনে—
এই বয়সে এমন ছবি
কেবা আঁকতে জানে!
পড়াশুনায় আগ্রহ তার
কেমনে হল বোঝাই যে ভার—
ইস্কুলে যায় সঙ্গে বাবার।
আলস্য নেই তার,
ইস্কুলে না-যেতে পেলে
মুখখানা হয় ভার।
বাবা-মায়ের সঙ্গে আসে
চোখ দু'টি আনন্দে ভাসে
ছুটে আসে আমার পাশে—
গল্প শোনায় ভালোবেসে।
কচি মুখের মিষ্টি কথায়
প্রাণের তলে কী ভাব জাগায়
বুঝাব কেমনে—
যে শোনে সেই জানে!

উপহার

দ্বাপরের "গীতাতত্ত্ব-সার"
সাধ্য নহে এ ঘোর কলিতে
মানিয়া চলার—
কলিযুগ অনুগামী
অমৃত কথার খনি
এই "কথামৃত" খানি
আজি তাই তব করে
দিনু উপহার!

(শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য রচিত)

মশা

সকাল-সন্ধ্যা দুইটি বেলা
মশার জ্বালায় ঝালাপালা—
বলছে সবাই পালা, পালা!
কোথায় পালাই উপায় যে নাই
পিছু পিছু চলছে সবাই—
নিস্তার নেই মশার হাতে
উড়ছে সদাই সাথে সাথে!

ডাল

বাঙালির ছেলেমেয়ে মোরা
শিশুকাল হতে—
শিখিয়াছি প্রতিদিন
ডাল-ভাত খেতে।
কিছুটা বয়স হতে
সে ভাতের সাথে
ঝোল হতে মাছ আর আলু
তুলি' দিতেন মা পাতে।
ধীরে ধীরে বয়স বাড়িতে—
আরও বহুতর ফলমূল
শাকসব্জি নানা
শিখিনু খাইতে।
কিন্তু প্রতিদিন দুই বেলা
আহারের পাতে—
বাটি ভরা ডাল খাইতাম
সে সবের সাথে—
শৈশবকালের সেই ডাল-আস্বাদন
রয়ে গেল ভরিয়া জীবন!
ভাতের সহিত মোর ডাল না-হইলে
তৃপ্তি হয় নাই কোনও কালে।
আজও এই বৃদ্ধ বয়সেতে
ডাল বিনা ভাত
নাহি রোচে কোনও মতে।
লেবু সহযোগে একবাটি ডাল
প্রতিদিন সকাল বিকাল—
খাই আমি তৃপ্তি ভরে
হরষিত চিতে!
বিধির কৃপার দান
এই ডালে জানি—
ডাল বিনা ভাত খেয়ে
বাঁচিব না আমি!

তোমার খোঁজে

নিঃসীম নীলিম ওই আকাশে চাহিয়া—
তোমারেই খোঁজে মোর হিয়া।
কোথা তুমি হে আমার প্রভু,
দেখা কি দিবে না মোরে
এ জীবনে কভু?
তোমা তরে প্রাণ মোর হয়েছে আকুল—
কৃপা করি দাও দেখা
ক্ষমি মোর সব ভ্রান্তি ভুল।
শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের কালে—
তোমারে রয়েছি আমি ভুলে।
জীবনের এই শেষ প্রান্তে আসি আজ—
তোমারে পড়েছে মনে,
হে হৃদয়রাজ!
তোমার কৃপার তরে মাগিনু শরণ—
কৃপা করি ও-চরণে করহ গ্রহণ।
স্থান দিয়া চরণেতে ধন্য কর মোরে—
প্রকাশিত হও মম অন্তর মাঝারে।
নিশিদিন অন্তরেতে দিয়া দরশন—
সার্থক করহ মোর মানব জনম!

প্রার্থনা

এ সংসারে মোহ ঘোরে আছি অচেতন—
কৃপা করি মোহমুক্ত কর
মোর মন।
সংসার মায়ায় ভুলে রয়েছি তোমারে—
মায়ামুক্ত কর হানি
আঘাত অন্তরে।

দুঃখ-বেদনার মাঝে স্মরিতে তোমারে
শক্তি দাও কৃপাময়
এ জীবন ভরে।
তুমি-হীন এ জীবন মিথ্যা যেন জানি—
"জীবনের ধ্রুবতারা"
হয়ে থাকো তুমি।
ভুলিতে দিও না তোমা-জীবনে মরণে
অবিরত প্রকাশিত থাকো
মোর মনে।
সংসার মাঝারে পাঠায়েছ মোরে
কর্ম করিবারে—কর্মজালে জড়াইয়া
ভুলেছি তোমারে।
কৃপা করি কর্মশেষে ডাকি নিও মোরে—
মোহমুক্তি ঘটাইয়া
হৃদয় মাঝারে।
কৃপাময়ী জগৎ-জননী তুমি
তব এই ভ্রান্ত সন্তানেরে
শত অপরাধ ক্ষমি
লও তুলি ক্রোড়ে!

কালো আর কালী

কালো-কালী দুই ভাই-বোন
অপরূপ রূপময়
দেখার মতন!
নিখুঁত কালোর মাঝে
ঝকঝকে চোখ—
রাতের আঁধারে দেখে
চমকায় লোক!

সাদা-কালো জননীর
যমজ সন্তান—
সকলের আদরের
কোলেতেই স্থান।
দুধ-ভাত খায় ওরা
সবার আদরে—
কখনও বা দুধ-রুটি
খায় ঘুরে ফিরে।
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে
সবার আদরে—
ভয়-ডর নেই মনে
বাড়ি বাড়ি ঘোরে।
পাড়ার কুকুর যদি
আসে কভু তেড়ে—
লাফ দিয়ে দুই জন
নিম গাছে চড়ে।
বড় ভাগ্যে জন্মিযাছে
দুই বোন-ভাই—
বেড়ালের ছানা হয়ে
দুঃখ জানে নাই!

শ্রীক্ষেত্র

দেবাসুরে মন্থন করিয়া
সাগর-অতল হতে
"শ্রীদেবী" লক্ষ্মীরে
আনেন তুলিয়া।
পবিত্র সে পুরী ক্ষেত্র
উড়িষ্যা দেশেতে—

জগন্নাথ-সহ লক্ষ্মী
থাকেন সুখেতে।
দূরদেশ হতে যত
পুণ্যার্থী আসিয়া
সাগরের জলে স্নান করি-
পূজা দিয়া লক্ষ্মী-জগন্নাথে
যান দেশে ফিরি।
প্রতি বৎসরের আষাঢ় মাসেতে—
আরূঢ় হইয়া রথে
জগন্নাথ স্বামী যান
মাসির বাড়িতে।
রথারূঢ় সেই জগন্নাথে
দর্শন করিতে যারা পারে—
দেহমুক্তি লাভ করি
যায় স্বর্গপুরে।
এ বিশ্বাস অন্তরে বহিয়া
পুণ্যার্থী সকলে
দর্শন করেন জগন্নাথে
রথযাত্রা কালে।
ভারতের চারিধাম মাঝে
অন্যতম জগন্নাথ ধাম—
দর্শনে ধন্য আমি
পূর্ণ মনস্কাম!

বোরোলীন

অভিনব আবিষ্কার এ যুগের
এক সুরভিত ক্রিম—
নাম "বোরোলীন"!

কত শত উপকারী
সুঘ্রাণ মনোহারী
তুলনাবিহীন—
এই বোরোলীন!
পোড়া ক্ষত দেহে যত
সব হয় লীন—
ব্যবহার করি বোরোলীন।
কাটা-ফাটা আদি যত
দেহময় চর্মক্ষত—
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় করে লীন
শুধু বোরোলীন।
শীতের বিশুষ্ক চর্ম হইবে মসৃণ
মালিশ করিয়া
বোরোলীন।
শরীরের সর্ববিধ দাগে
অন্য মালিশের আগে
মাখ বোরোলীন—
সাতেক দিনের শেষে
দেখিবে অবাক চোখে
সব দাগ হয়েছে বিলীন।
শরীরের কোনও স্থানে
অগ্নির দহনে—
অবিলম্বে মাখ বোরোলীন,
মুহূর্তেই সেই স্থান হবে জ্বালাহীন।
হিতকারী চর্মবন্ধু না-হয় এমন—
বোরোলীনের মতন!
অতিশয় স্বল্পমূল্যে
পাওয়া যায় এ-অমূল্য ক্রীম-
"বোরোলীন-প্রেমী" আমি
বোরোলীনে সমাদর করি
চিরদিন!
দেশের লোকের তরে
বোরোলীন আবিষ্কারে

উপকৃত হোল দেশবাসী—
ধন্য ধন্য জি. ডি. ফার্মেসি!

সূর্যপ্রণাম

পৃথিবীর জন্মদাতা পৃথিবীর প্রাণ—
জ্যোতির্ময় হে সবিতা,
তোমারে প্রণাম!
কণামাত্র তব তেজ দানে
তেজোময় কর মোর প্রাণ,
তোমারে প্রণাম।
তব তেজে রয়েছে বাঁচিয়া
জগতের প্রাণীদের প্রাণ—
কৃতজ্ঞ অন্তরে জানাই তোমারে
আমার প্রণাম।
সৌরমণ্ডলের বাজা
তুমি ভগবান—
তোমারে প্রণাম।
গ্রহণ লাগিলে লোকে
চোখে অন্ধকার দেখে
তোমার প্রকাশে পুনঃ
ফিরে পায় প্রাণ।
হে দেবতা, তোমারে প্রণাম।
প্রভাত-গগনে তোমার দর্শনে
আনন্দে আপ্লুত হয় প্রাণ—
সেইক্ষণে বিমোহিত প্রাণে
তোমার চরণে রাখি আমার প্রণাম!

কামিনী কুসুম

ঝোপাকৃতি বৃক্ষশিরে
গোলাকার ছোট ছোট
পাতার মাঝারে—
কামিনী ফুলের কুঁড়ি
মাথা তোলে ধীরে।
প্রভাত-সমীর স্পর্শে
ফোটে একে একে—
নয়ন মোহিত হয়
সেই শোভা দেখে।
কামিনী ফুলের শোভা
অতিশয় মনোলোভা—
সুবাসে বাতাস ভরি ওঠে,
তরুণ অরুণ করে
অলিকুল আসে উড়ে
কামিনী ফুলের মধু লোটে।
শুচিশুভ্র কামিনী কুসুম
প্রস্ফুটিত হয়
দেবের চরণ-স্পর্শ তরে,
সে চরণে উৎসর্গিত হয়ে
সুবাসের অর্ঘ্য দিয়ে
আপন জীবন ধন্য করে!

প্রতীক্ষা

শ্রীশ্রীমা'র শুভ-আগমন বার্তা শুনি
আনন্দে অধীর হল প্রাণ—
তাঁর শ্রীচরণ দর্শন আশায়
প্রতীক্ষানিরত রহিলাম।

প্রত্যাশার দিনগুলি
একে একে বহিয়া চলিল—
সহসা একদা তাঁর শুভ আশীর্বাদ
আসিয়া পৌঁছিল।
শারদীয়া পূজা-উপহার
নববস্ত্র এক পাঠালেন শ্রীশ্রীমা
আমারে—জানালেন যথাকালে
ডাকিবেন মোরে তাঁর দর্শনের তরে।
আশায়-আনন্দে কাটিতে লাগিল
মোর দিন ব্যাগ্র প্রতীক্ষায়—
মানসে প্রণমি তাঁরে
প্রতি রাতে নিদ্রার বেলায়।
নিত্য স্মরণের ফলে অতি ধীরে ধীরে
মানসে দর্শন লভি অন্তর মাঝারে—
অনুভবে বুঝিলাম—
প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল
শুধু এই দর্শনের তরে!
জানিলাম—
এ দর্শন শুধু মা'র মঙ্গল ইচ্ছায়।
শান্ত হল মন মোর
মায়ের কৃপায়!

শরণাগতি

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

সংসারে জন্মিয়া জীব যত
আপনার নিত্যসত্য পরিচয়
সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ
হইয়া বিস্মৃত—

মোহময় সংসার আবর্তে পড়ি
জন্ম-মৃত্যু আবর্তনে ভ্রমে অবিরত!
কিন্তু তারে আপনার অমৃত-স্বরূপ পরিচয়
অবশ্যই জানিতে হইবে—
সংসারের ভ্রান্ত মোহ ত্যজি
সে স্বরূপে ফিরিতে হইবে,
মানব-জন্মের উদ্দেশ্য সাধন
করিতে হইবে।
জীবন ভরিয়া সচেষ্ট থাকিয়া
পরমপুরুষে অন্বেষণ করি—
আত্মজ্ঞ সে মহাপুরুষের
শরণাগতির পথ ধরি
চলিতে হইবে।
পরিপূর্ণ শরণাগতির পথ অতীব কঠিন—
গুরুরে স্মরিয়া ব্যাকুল হইয়া
তাঁর বাণী তাঁর নির্দেশ মানি
চলিতে হইবে প্রাণপণ,
পরনিন্দা পরচর্চা ছাড়ি
করিতে হইবে আপনার
দোষ অন্বেষণ।
আপনার সর্ববিধ ব্যক্তিত্বের দিয়া বিসর্জন
পরিপূর্ণ প্রাণে গুরুর চরণে
সমর্পিয়া আপন জীবন—
জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে আত্ম-দরশনে
নিরন্তর সচেষ্ট রাখিতে হবে
নিজ মন!
আপনারে গুরুর হাতের যন্ত্রস্বরূপ মানি
হৃদয় মাঝারে স্মরি শ্রীগুরুর বাণী,
তাঁর মাঝে হবে যবে নিঃশেষে বিলীন—
যথার্থ শরণাগতি লভিবে সেদিন!

ষষ্ঠীচরণ (১)

আশ্বিনের শুভ দুর্গাষষ্ঠী দিনে যবে
মেনকার প্রথম সন্তান জন্মাইল—
মঙ্গল শঙ্খের রবে হুলুধ্বনি মাঝে
গৃহ-পরিজন নবজাতকেরে
বরণ করিল।
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া
মেনকা সংবাদ পাঠাইল—
কী নামে হইবে ডাকা এ নবজাতকে
তাহাও তাঁহারে জিজ্ঞাসিল।
পরম করুণাময় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর
জানালেন মেনকারে সস্নেহ আদরে—
"শ্রীদুর্গা-ষষ্ঠীতে জন্ম তোর সন্তানের
'ষষ্ঠী' নামে ডাকিস তাহারে।"
আনন্দে আপ্লুত হয়ে মেনকা সুন্দরী
"ষষ্ঠী" নাম রাখিল পুত্রের—
জন্মমাত্র আশীর্বাদধন্য হোল
এই পুত্র তার—নিশ্চিত সার্থক
হবে জীবন তাহার!

ষষ্ঠীচরণ (২)

দুই বছরের ছোট্ট খোকন
ষষ্ঠীচরণ নাম—
উজ্জ্বল তার চক্ষু দু'টি
বরণ চিকণ-শ্যাম।
টল্‌মলিয়ে হেঁটে হেঁটে
এ-ঘর ও-ঘর বেড়ায় ছুটে-

ধরতে গেলেই হাসি মুখে
মায়ের কোলে যায় সে উঠে।
মায়ের বুকে মুখটি ঢেকে
লুকিয়ে রাখে আপনাকে—
একটু পরেই শাড়ির ফাঁকে
মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখে।
কচি মুখে নেইকো বুলি
তাকায় শুধু চক্ষু তুলি—
দুষ্টু চোখের মিষ্টি হাসি
দেখেই প্রাণে লাগে খুশি!
দেবতাকে ভক্তিভরে
ডাকি খোকার কৃপার তরে—
পায় যেন তাঁর কৃপায় খোকন
শান্তি-সুখের দীর্ঘ জীবন!

জীবনপথের প্রান্তে

সুদীর্ঘ জীবনপথ বাহি আসিয়াছি আজি
তার প্রান্ত-সীমানায়—
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবারে
কেন মোর মন আজি চায়?
স্মৃতির সুদূর প্রান্ত হতে উঠিছে ভাসিয়া
কত শত আনন্দের ছবি—
শৈশব-কৈশোর আর মধ্য-যৌবনে
ঘটেছিল সে ঘটনা সবই!
আজ স্মৃতি-রোমন্থনে দেখি তাহাদের
বিমুগ্ধ নয়নে—ছায়াছবি সম ভাসি
উঠিতেছে তারা মোর
হৃদয় গগনে।

তেমনি সুস্পষ্ট আর সত্যরূপে দেখিবারে
পাই তাহাদের—যেরূপ প্রত্যক্ষ ছিল
সে সকল বাস্তব ঘটনা
সে দিনের।
কিন্তু মোর সম্মুখের এই পথ হেরি আজ
সম্পূর্ণ অজানা—চলেছি কোথায় আমি
এ পথ বাহিয়া না জানি ঠিকানা।
কে আমারে চালনা করিতেছেন
দিবানিশি সম্মুখের পানে?
চিনি না তাঁহারে আমি
ভাবি মনে মনে!
কে বা সেই অদৃশ্য চালক যিনি চালনা
করেন সকলেরে—অন্তর মাঝারে
বাস যাঁর জীবাত্মা আকারে?
শুনিয়াছি জ্ঞানিগণ—
সুকঠোর সাধনা করিয়া আজীবন
সে অদৃশ্য চালকের লভেন দর্শন!
সে অপূর্ব দর্শনের ফলে
জীবদেহখানি ফেলে জীবাত্মার সাথে
ঘটে পরমাত্মার মিলন—
নিঃসীম সাগর জলে মেরুর তুষারখণ্ড
ডুবি গলি-মিশি একাকার
হওয়ার মতন!

রুদ্রাক্ষ

পুরাণে বর্ণিত আছে রুদ্রাক্ষের জন্মকথা-
দেব আদিদেব শঙ্করের
বিস্ফারিত নেত্রনীর হতে

জন্মেছিল প্রথম রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ
এই পৃথিবীতে!
গ্রীষ্মের সময় রুদ্রাক্ষের-বৃক্ষশির
শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পুষ্পে ভরি রয়—
হেমন্তের আগমনে সে পুষ্প হইতে
গুচ্ছভরা গোলাকৃতি রুদ্রাক্ষের
ফল জন্ম লয়।
পঞ্চকোষ-যুক্ত রুদ্রাক্ষের
"পঞ্চমুখী" রুদ্রাক্ষে নামেতে পরিচয়—
ইহাই স্বভাবে সৃষ্ট,
ব্যতিক্রম আরও কিছু হয়।
এক হতে চতুর্দশ কিংবা একবিংশ
মুখযুক্ত রুদ্রাক্ষের ফল কোনও কোনও
বৃক্ষে কদাচিৎ মিলি যায়—
বিভিন্ন প্রজাতি আর উপজাতি
বহু বৃক্ষ সারাদেশব্যাপী
জন্মায়।
রুদ্রাক্ষের জপের মালায়
অষ্টোত্তর শত রুদ্রাক্ষের বীজ
গাঁথা হয় রক্তিম সুতায়—
অধিকন্তু এক বীজ সাক্ষিরূপে রাখে
সে মালায়।
শিবমন্ত্রে দীক্ষিত জাপক
"ওঁ জুং সাং" কিংবা "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ"
—এই মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র
ভক্তিভরে জপেন মালায়,
দেবকৃপা লাভের আশায়!
জাপকের স্তবে তুষ্ট মহাদেব আসিয়া স্বয়ং
সর্ববিধ বিপদেতে সে জাপকে
করেন তারণ—এ বিশ্বাসে পূর্ণ
যত ভক্তদের মন!

আমি ও আমার

"আমি ও আমার"—ইহাই সংসার!
জন্মক্ষণ হতে "আমি" অনুভূত
হয় চিতে!
জ্ঞান লাভ করিবার পরে—
"আমার" জননী বলি জানে
শিশু মা'রে।
"আমার" গণ্ডিটি তার অতি ধীরে ধীরে
লভিবে বিস্তার—শৈশবের চিন্তা
মনে তার, পিতা-মাতা
উভয়ই আমার,
তাদের উপরে মোর পূর্ণ
অধিকার!
এই ঘরে এ বাড়ির যত গুরুজন
সবাই আমার—তারা আমারই আপন!
এখানে রয়েছে যত খেলার সামগ্রী
পুরান-নূতন, সবই মোর
সব মোর মনের মতন।
জীবন-মধ্যাহ্নে জানে মনে—
পত্নী-পুত্র-কন্যাগণ
এদের সকলে মোর একান্ত আপন!
এই ঘরবাড়ি এই টাকাকড়ি
এত সব ঐশ্বর্য-সম্ভার
সকলি আমার!
আমি ও আমারে কেন্দ্র করি
আমার এ সুখের সংসার—
ভোগবিলাসের কেন্দ্র
আনন্দ-আগার!
জীবন-সায়াহ্নে রোগ-শোক-দুঃখক্লিষ্ট
শান্তিহীন মনে ধীরে ধীরে ক্লান্তি
আর অবসাদ নামে—
সেইক্ষণে ফিরে মন শান্তির সন্ধানে!

সংসারের ভোগসুখে বিরতি নামিলে
আমি-আমাদের "খেলা"
মিটে সেইকালে।
"তুমি ও তোমারে" মন ফিরে—
আকুল হৃদয়ে খোঁজে মন তাঁরে,
তাঁহার বিরহে ব্যর্থ মানে
এই জীবনেরে!

মন্কু সোনা

ছোট্ট আমার মন্কুসোনা
আসবে মোদের ঘরে—
সেই আশাতে আনন্দেতে
প্রাণটা আছে ভরে!
কখন তারে দেখতে পাব
শুরু হবে খেলা—
ভেবে ভেবে আনন্দেতে
কাটল সকাল বেলা।
হাসিভরা মুখখানি তার
দেখতে পাব কখন আবার—
চঞ্চল চোখ দুয়ার পানে
তাকায় বারে বার!
কচি মুখের মিষ্টি হাসি
দেখলে প্রাণে জাগে খুশি—
তাই তো তারে ভালবাসি
দেখতে চাই আবার।
ভগবানে কাতর প্রাণে এই মিনতি করি—
রাখেন যেন জীবনটি তার
সুন্দরে আর সফলতায় ভরি!

মঙ্কুরানী

মঙ্কুরানী সোনার খনি
আঁকে ছবি পায় যখনি।
তাই তো আমি তারি তরে
রাখি ছবি যত্ন করে।
এই তিনটে বই আমার
আজ পাঠালেম উপহার।
সত্যি বটে পুরাতন—
নেইকো জুড়ি এর মতন!
প্রথম বইটি খুললে 'পরে
খুশিতে মন যাবে ভরে—
দেখবে "দ্বীপ" বলে কারে
আন্দামান আর নিকোবরে।
নারিকেল গাছের সারি
প্রাণকে দেবে পাগল করি।
বৃটিশ শাসক দ্বীপের ঘরে
কয়েদি এনে রাখত পুরে।
ঋষি অরবিন্দ যিনি—
বন্দী ছিলেন হেথায় তিনি।
পরের বইটি খুলবে যবে—
জীবজন্তুর দেখা পাবে।
পাখি-পশু রকমারি
দেখবে সুখে চক্ষু ভরি।
সবার শেষের বইটি খাসা—
রূপকথার গল্পে ঠাসা।
পড়বে যবে গল্পগুলি
মনের দুয়ার যাবে খুলি।
প্রাণে খুশির উঠবে ঢেউ—
ভাববে আমি ওদেরই কেউ!

পণ প্রথা

মোর জন্মস্থান—অবিভক্ত বাংলাদেশ
জিলা চট্টগ্রাম।
সে জিলার প্রান্ত সীমানায়
কর্ণফুলি নদী-কিনারায়
ফিরিঙ্গিবাজারে—
মোর পিতামহ আর পিতা
মোরা সব বোন আর ভ্রাতা
জন্মিয়াছি এক এক করে।
সেইকাল হতে সুদীর্ঘ সময়
বাস করিয়াছি মোরা সে বাড়িতে
আত্মীয়-স্বজনগণ সাথে।
পিসিদের বিবাহ-কালেতে কিংবা মোর
দিদি-দাদাদের বিবাহেতে
শুনিয়া এসেছি মোরা আজীবন
বিবাহ-নিয়ম।
বিবাহের কালে পাত্রীর পিতা ও মাতা মিলে
সানন্দে স্বেচ্ছায় কন্যা-জামাতায়
মূল্যবান বস্ত্র-অলংকার যাহা
উপহার দেন—
পাত্রের পিতা ও মাতা আনন্দিত মনে
তাহা গ্রহণ করেন।
পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসকগণ ভারত ত্যজিলে—
স্বার্থলোভী দেশীয় শাসকগণ
সোনার ভারতে দ্বিখণ্ডিত করিল যখন
নিরুপায় পিতা-সহ আত্মীয়-স্বজন
পূর্ব্ববঙ্গ ত্যজি পশ্চিম বাংলাতে আসি
করিলেন বসতি স্থাপন!
এই স্থানে পশ্চিম বাংলায় বিবাহের প্রথা হেরি
মনে মোর বিস্ময় জাগায়!
পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ-সম্বন্ধ নির্বাচনে-

যোগ্যতা ও অর্থ-সচ্ছলতা
বিবেচিত হইবে প্রথমে।
তারপর হইবে বিচার—অর্থ আর
স্বর্ণ-অলংকার কত পরিমাণ
দিবার সামর্থ্য আছে
পাত্রীর পিতার!
পাত্রের পিতার দাবি যেইখানে মানিয়া নিবেন
পাত্রীপক্ষগণে—উভয়ে বিবাহ-সম্বন্ধ
স্থির হবে সেইখানে!
এই প্রথা দরশনে বিস্ময় মানিনু মনে মনে—
এই হীন প্রথা সুশিক্ষিত বাঙালির মনে
জাগরিত হইল কেমনে?
বিষয় বাসনা মানুষেরে নামাইতে পারে
কোন স্তরে? আত্মসম্মানের আর
শিক্ষিত মনের নাই কোনও মূল্যবোধ
তাঁহাদের মনে?
সযত্নে-লালিত স্নেহের দুলাল আপন পুত্রেরে
অতি তুচ্ছ অর্থ-লালসায় বিক্রয় করেন
তাঁরা কন্যার পিতারে?
ভাবিতে লজ্জিত হই আপন অন্তরে!
হিন্দুর সমাজে জীবনের অন্যতম মাঙ্গলিক
কাজে—ব্যবসায়ী-মনোবৃত্তি
এই সভ্যযুগে কীরূপে বিরাজে?
উত্তর মিলে না খুঁজি হৃদয়ের মাঝে!

মধুলগ্ন

হে চিরসুন্দর, হে মহান
তব করুণার দান মোর এই প্রাণ!
তোমার রচিত এই সুন্দর ভুবন—
অন্তরে বাহিরে হেরিতে তোমারে
আকুল হয়েছে প্রাণমন।
অন্তরের তলে নিত্য আঁখিজলে
করিতেছি তোমার ধেয়ান—
বাহির বিশ্বেতে আঁধারে-আলোতে
নিঃসীম গগনতলে আঁখি মেলি
করিতেছি তোমার সন্ধান!
কোথা তুমি জ্যোতির্ময় মহাবিশ্বপ্রাণ—
কেমনে পাইব আমি তোমার সন্ধান?
কীরূপ ব্যাকুল হলে হৃদয় মাঝারে
লভিব তোমার দরশন—
ধন্য হবে আমার জীবন?
মোর ব্যাকুলতা হেরি কবে তুমি কৃপা করি
দিবে তব পুণ্য-দরশন—
যে-কৃপার তরে যুগ যুগ ধরে
সাধন করেন যত মুনি-ঋষিগণ?
জানি না কখন আমার জীবনে
আসিবে সে মধুর লগন—
আর কতকাল জন্মজন্মান্তর
প্রতীক্ষা করিতে হবে
ধন্য করিবারে এ জীবন!
হে আমার প্রভু, তব কৃপাকণা দানে
বঞ্চিত কারো না মোরে কভু।
তব কৃপাকণা তরে ব্যাকুল অন্তরে
প্রতীক্ষানিরত রব জন্ম জন্ম ধরে।
এ বিশ্বাস আছে মনে—
মধুময় মধুলগ্নে লভিয়া মধুর কৃপা

মধু সনে হবে মোর
মধুর মিলন—
জীবাত্মার "মহামুক্তি"
হবে সেইক্ষণ!

যুগস্রষ্টা

অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির প্রায়
অভিন্ন সত্তায়—যুগস্রষ্টা স্বানুভবদেব
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আর শ্রীমা,
এ ঘোর কলির শেষে
অবতরি আসেন ধরায়!
অখণ্ড একক যে-মহাচৈতন্য সত্তা
ভিন্ন রূপে-নামে জীবের জীবনে প্রকাশিয়া
বহুত্বের বিভ্রম ঘটায়—
সে মহাসত্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে
কলিজীবে, নবরূপে আগমন
তাঁদের এ ধরায়!
আপনারে বিশ্বজননীর শ্রীমুখের যন্ত্রমাত্র জানি—
ভগবৎ তত্ত্ব যত গীত আর বাণীর
মাঝারে অবিরত, লাগিলেন প্রচার
করিতে, কলির তমসাচ্ছন্ন
জীবেরে বাঁচাতে!
অমৃত-সন্তান জীবগণ—মোহঘোরে বিস্মরি
আপনা জন্মজন্মান্তর ধরি মায়াময়
এ সংসারে সহিতেছে জীবনযন্ত্রণা!
তাহাদের উদ্ধারের তরে—সম্মিলিত দেশবাসিগণের
মাঝারে শান্ত-ধীর সুগম্ভীর স্বরে
আত্মজ্ঞান-আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিতে

নিয়োজিত করেন নিজেরে—
বিশ্বহিত তরে।
জনগণে মহতের সঙ্গ দিয়া তাহাদের কল্যাণ
চেষ্টায় নির্দিষ্ট সন্ধ্যায়—
উপস্থিত থাকিয়া আপনি
ভজন-কীর্তন আদি শুভ অনুষ্ঠান সহ
শুনাতেন নানা তত্ত্ববাণী।
কখনও স্বয়ং ভাবাবেশে দু'বাহু তুলিয়া
কীর্তনের মাঝে নাচিতেন গাহিতেন
আপনা ভুলিয়া—কখনও সে কালে
সমাধি মাঝারে লুণ্ঠিত হইয়া
পড়িতেন ভূমিতলে!
সেই অনুপম ভাবের প্রভাবে
উপস্থিত জনগণমনে আধ্যাত্মিক ভাবের
স্ফুরণ হত সেইক্ষণে!
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কৃপা-আকর্ষণে
কোনও কোনও ভক্ত-মনে অনিত্য সংসার প্রতি
বিরাগ জন্মায়—তাঁহার আদর্শ
অনুসরি সত্যপথ ধরি শরণাগতির
পথে তারা অগ্রসরি যায়!
দেশে দেশে লোকে লোকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের প্রতি
আকর্ষণ বাড়িতে থাকিল—তাঁর ভক্তসংখ্যা
ক্রমে অগণন হল।
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের একান্ত আপন মাতৃসমা
সেবিকা তাঁহারে সযতনে লালন করেন
দীর্ঘকাল ধরে।
সেইকালে তাঁর শ্রীমুখের "গীত" আর "বেদবাণী" যত
নিষ্ঠা আর ধৈর্য সহকারে দীর্ঘদিন ধরে—
করেন সে সব সংগৃহীত।
তাঁর সেই সংগ্রহ হইতে আজ ক্রম-প্রকাশিত
"স্মৃতিগাঁথা" নামে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের
জীবনকাহিনী করিয়া শ্রবণ,

অনুভব করে বিশ্বজন—
সামান্য মানব তিনি নহেন কখনও,
নররূপধারী পরব্রহ্ম স্বয়ং
জগৎ-কারণের কারণ!
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বরাজি
সেবিকার সংগ্রহ হইতে লভি আজি
তাঁর অনুরাগী ভক্তগণ—ধীরে ধীরে
পুস্তক আকারে করেন মুদ্রণ!
সে সকল পুস্তক হইতে অভিনব তত্ত্বরাশি
বিশ্বজন হৃদয়ে প্রবেশি
অজ্ঞান-আঁধারে বিনাশিবে—
সত্যের ভাস্বর পথে তাঁহাদের
অগ্রসরি দিবে।
ঘোর অন্ধকার এই কলিযুগ অবসান তরে
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের আগমন এ সংসারে—
তাঁর আগমনে পরমসত্যের আলোকচ্ছটায়
বিশ্বজন পথ খুঁজি পাবে,
আপনার বিস্মৃত স্বরূপে
চিনি লবে!
কলিযুগ অপসৃত হয়ে
সত্যযুগ সূচিত হইবে!

জন্মদিন

জন্মদিনের ভোরে—প্রণাম জানাই
সবার আগে প্রাণের ঠাকুরেরে!
তারপরেতে একে একে বাবা-মা
আর অন্য গুরুজনে—
নতশিরে করি প্রণাম আনন্দিত মনে!

মোর জীবনে এই দিনটির মূল্য
সবার বেশি—হাসি-খুশি-গল্পে মাতি
সবার সাথে আনন্দেতে কাটবে
দিবানিশি!
আদর করে সবাই মোরে দিবে উপহার—
হরেক রকম গল্পের বই
তুলনা নেই যার!
বাড়ির যত আপন জনে
পুলি-পিঠে-মিষ্টি এনে
সকাল থেকে ব্যস্ত হবে
খাওয়াতে আমায়—
আনন্দেতে সবার সাথে সারাটা দিন
খেতে খেতে—খাওয়াই হবে দায়।
বিকেল বেলা বাবার সাথে মা ও আমি
তিনজনাতে গাড়ি চড়ে এধার-ওধার
বেড়িয়ে বেড়াব—এমনতর
সুখের দিনটি আবার কবে পাব!
রাত্রি এলে দিনের শেষে
ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বিছানাতে ঘুমিয়ে
যখন যাব—স্বপ্ন মাঝে
মহাসুখে পরী হয়ে পরীর দেশে
বেড়িয়ে বেড়াব!

জীবনসন্ধ্যা

সুদীর্ঘ জীবন-প্রান্তে আসি
জাগে আজ মনে—পরজন্ম তরে
পাথেয় কিছুই সঞ্চয় তো হল না
জীবনে। রুদ্ধশ্বাসে এসেছি

চলিয়া জীবনের দীর্ঘপথ বাহি—
সংসার মায়ার দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকে
দৃষ্টি মোর রেখেছিল ঢাকি।
আজি এই শেষের প্রহরে জীবনে
যেটুকু সময় আছে বাকি
প্রাণপণ ধৈর্য ও নিষ্ঠায় চেষ্টা করা
বিনা উপায় না দেখি।
তাই আজ নিয়েছি শরণ শ্রীগুরুচরণ
একনিষ্ঠ মনে স্মরণে-মননে-ধ্যানে
কাটাইব দিবস-রজনী আমরণ।
আশা আছে ও-চরণে করি নিবেদন
মোর এই দেহ-প্রাণ-মন
সার্থক করিব এ জীবন!
শরণাগতির এই পথ—ভাবি মনে
নহে তো সহজ। কেমনে হইবে পূর্ণ
তবে মোর মনোরথ?
চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই—
মনে মনে ভাবি পুনঃ তাই।
জীবনের অবশিষ্ট দিনে—
কাটাব নিষ্ঠার মাঝে
শ্রীগুরু শরণে!
মনে প্রাণে দিবানিশি গুরুরে স্মরিয়া
ধেয়ানে চিন্তায় তাঁরে মনন করিয়া
দেহ-মন-প্রাণ গুরুময় করি
যদি তাঁর কৃপাকণা লভিবারে পারি—
নিশ্চিত পাইব এ জীবনে
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ-তরী!

মুইবাঙ্কু

সেই শিশুকালে—যবে আমি
অতি শিশু বছর তিনের,
দাদা-দিদি সকলের সাথে
ডাকিতাম আমাদের মুহরিবাবুকে
"মুইবাঙ্কু" বলে—স্পষ্ট
উচ্চারণ মোর হত না সেকালে।
আমাদের বাড়ি হতে দূরে
মাঠের মাঝারে বৈঠকখানা ঘরের
সংলগ্ন ছোট ঘরে—বাস করিতেন
মুহরি মশাই আত্মীয়-স্বজন
ছাড়িয়া একাই।
মোর পিতা ওকালতি ব্যবসায়ে
নিজ প্রয়োজনে নিযুক্ত করেন
এই মুহরিরে—তাঁর কার্য সম্পাদনে।
প্রত্যহ সকালে আদালতে গিয়া—
নিত্য প্রয়োজন মতো দলিল-কাগজ
যত রাখিতেন তিনি গুছাইয়া।
ভিন্ন ভিন্ন মোকদ্দমা যত নিয়ত হইত
সকল প্রকার দলিলাদি তাঁহাকেই
নথিভুক্ত করিতে হইত।
পিতার বেতনভোগী কর্মচারী হয়ে—
ছিলেন মুহরিবাবু আমাদের গৃহে।
প্রত্যহ সকালে আটটা বাজিলে
মায়ের নির্দেশে আমাদের ভাইবোন
কোনও একজন—ডাকিয়া অনিত
তাঁরে বাড়ির ভিতরে ভোজনের তরে।
আমাদের রন্ধনশালার দীর্ঘ বারান্দাতে—
মেঝেতে পাতিয়া পিঁড়ি সদ্য-পক্ব
তপ্ত ডাল-ভাত দিতেন মা
তাঁহারে খাইতে।

আমরা কখনও সকৌতুকে আসি
দেখিতাম তাঁর খাওয়া সেই বারান্দার
তক্তপোশে বসি।
তপ্ত সেই ডাল-ভাত খাইতেন মুহরিমশাই
পরম আগ্রহে—মাত্র একখানা
ভাজা লঙ্কা সহযোগে!
খাওয়া সারি তৃপ্ত মনে পান মুখে দিয়া—
হাজির হতেন তিনি বেলা নয়টায়
আদালতে গিয়া।
বেলা যবে হত এগারটা—স্নান-খাওয়া
সারি পিতা দু'ঘোড়ার ফিটনগাড়িতে চড়ি—
উপস্থিত হইতেন আদালত বাড়ি।
সেখানে মুহরিবাবু সনে মিলিত
হইয়া ওকালতি কাজ যত
করিতেন তাঁরা মন দিয়া।
বিকাল বেলায় মাঠে আমাদের যবে
শুরু হত খেলা—আদালত ছুটি শেষে
মুহরিবাবুও ফিরিতেন বাড়ি সেইবেলা।
প্রতিদিন ফিরিবার কালে তিনি—
আনিতেন তেলে-ভাজা গরম বাদাম
এক ঠোঙা কিনি।
নাম ধরি সকলেরে স্নেহভরে ডাকি একে একে—
নিজ হাতে ভাগ করি দিতেন
সে ভাজা সকলকে।
দৈবক্রমে যদি কোনও দিন তিনি
ফিরিতেন বাড়ি বাদাম না-কিনি—
আমরা সকল ভাইবোনে মিলি এক সনে
ঘিরিয়া তাঁহারে চতুর্দিকে—
উচ্চ কলরবে করিতাম তাঁরে
পাগলের প্রায় সেইক্ষণে।
আজ এত দীর্ঘকাল পরে
শৈশবের প্রিয় সেই মুহরি বাবুরে
কেন মনে পড়ে?
শৈশবের সেই আনন্দ-মধুর দিনগুলি

টানিতেছে মোর মনে
পিছনের পানে!
তাই তাঁরে ভুলিতে পারিনি আজও,
এতদিনে—ভুলিব না কভু
এ জীবনে!

কেক

ইংরাজি বৎসরের প্রথম দিনে—
ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ মিতা দিল মোদের এনে,
নিজের হাতে তৈরি করা প্রকাণ্ড এক
"কেক," ইংরাজি নিয়মে!
অনুরোধে তার তখনি তা কেটে—
খেলাম আমরা সেটি
আহ্লাদেতে মেতে।
প্রশংসাতে মুখর সবাই এমন কেকটি খেয়ে—
মনে হল বুঝি সবার মধুর স্বাদে
প্রাণ রয়েছে ছেয়ে!
অপূর্ব কেক খেয়ে!
খাওয়ার পরে সবাই বসে কেকের গল্পে
উঠল মুখর হয়ে—কোথায় কবে কেবা
কত "সুস্বাদু" আর "দামি" কেক
খেয়েছে—তাই নিয়ে!
এর পরেতেই শুরু হল—জন্মদিনের
হিসাব-সহ উপরোধের পালা,
কাহার-ক'টা কেক প্রয়োজন—
কার বাড়িতে কবে কখন—হিসাব
এল মেলা।
এবার, মিতারানী—ভাবলো মনে
"কেক" বানিয়ে একি ফ্যাসাদ

জুটলো এবার—এমনতো
ভাবিনি।
নিরুপায়ে লক্ষ্মী মা-য়ে মনে মনে ডাকে
কাতর হয়ে—"উপায় করো, মাগো,
এবার বাঁচুক তোমার মেয়ে!"
স্মরণ মাত্র লক্ষ্মীমাতা হাজির
প্যাঁচার পিঠে—
মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙতেই
বুঝলো তখন, "স্বপ্ন এটা বটে!'

চাদর

মিতার হাতে তৈরি করা—
আগাগোড়া সূচিশিল্পে ভরা,
অপূর্ব সেই চাদরখানা,
নূতন বছর শুরু হতে নিয়ে এসে
নিজের হাতে বিছিয়ে দিল বিছানাতে,
শুনল না মোর মানা!
এমন চাদর পেতে কুণ্ঠা জাগে শুতে—
ঘর-সাজানোর যোগ্য চাদর,
কেমনে শুই তাতে?
অবশেষে শুতেই হল অনেক দ্বিধার
পরে—অস্থিরতায় রাত কাটিয়ে
জেগে উঠি ভোরে!
মনে ভাবি, হায়, এমনতরো হাতের কাজের
তুলনা কোথায়! নিত্য-ব্যবহারের ফলে
অল্পদিনেই যাবে চলে
এই চাদরের রূপ—
এমন চাদর নষ্ট হলে মিলবে না আর
কোনও কালে—ভেবে ভেবে ক্ষণে ক্ষণে
জাগে মনে যুক্তি অপরূপ।

মিতার মনের সাধ মিটাতে
তার দেয়া এই চাদর পেতে শুধু আমি
কয়েকটা দিন শোব—তারপরেতেই
বিছ্না হতে তুলে নিয়ে আলমারিতে
পরম যত্নে তুলে রেখে দেব।
চাদরখানা দেখলে পরে মিতার মুখটি
মনে পড়ে—ভালোবাসায় ভরা
সে মুখখানা, যতেক মুখ দেখা
আছে বাড়িতে আর দূরে-কাছে
মিতার মুখের নেই যে তুলনা!

পরব্রহ্ম

(শ্রীম-কথিত "কথামৃত" গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
শ্রীমুখের বাণীর অনুসরণে রচিত)

সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ—
অনুভব-বেদ্য শুধু বাক্যমনাতীত!
অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির মতো
"ব্রহ্ম আর শক্তি" কিংবা "পুরুষ" ও
প্রকৃতি" অভিন্ন হইয়া ভিন্ন নামে
প্রকাশিত!
নিষ্ক্রিয় অবস্থা তাঁর "ব্রহ্ম" নাম ধরে—
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্যের কালে
"শক্তি" কহে তাঁরে।
ব্রহ্ম যবে হন "পুরুষ" নামেতে অভিহিত—
"প্রকৃতি" নামেতে শক্তি হয়েন বর্ণিত!
"শিব" নামে যবে ব্রহ্ম হবেন উল্লিখিত—
"কালী" নামে শক্তি সেথা হবেন
বিদিত।

কুণ্ডলী আকারে সর্প ব্রহ্মের উপমা—
সচল সর্পের সনে শক্তির তুলনা।
বিশ্বময় যাহা সবই ভাষাতে প্রকাশে—
একমাত্র "ব্রহ্ম" বস্তু মুখে নাহি আসে।
এ কারণে ব্রহ্ম চির-অনুচ্ছিষ্ট রয়—
মুখে উচ্চারিত শব্দ উচ্ছিষ্ট হয়।
বহু জনমের সুকঠিন সাধনার ধন—
"ব্রহ্মানুভূতি" কদাচিৎ লভে জ্ঞানিগণ।
এ অপূর্ব অনুভূতি লাভে—একবিংশ
দিবসান্তে দেহ নাশ হবে।
পরমাত্মা সনে জীবাত্মা তাঁহার
মিলি-মিশি এক হয়ে যাবে।
এ মিলন "সমাধি" নামেতে হয় উল্লিখিত—
নির্বিকল্প-সমাহিত জীব হয়
জন্ম-মৃত্যু চক্র বহির্ভূত!
অপূর্ব আনন্দময় এই "মহামুক্তি" লাভে
মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা—জীব মাঝে
একমাত্র মানুষের আছে এই
"অতি-বিশেষ" ক্ষমতা!
যুগে যুগে পৃথিবীতে পরমাত্মা স্বয়ং আসিয়া
নরদেহ ধরি জন্ম লন—
জগতের হিত তরে হয় তাঁর
এই আগমন।
সংসারের মানবেরে উদ্ধার করিতে,
তাহাদের নিজ নিজ স্বরূপ জানাতে
"সদ্‌গুরু" রূপে আগমন তাঁর
এ জগতে। মানব অন্তর হতে
পাশব প্রবৃত্তি নাশি আপনার
চৈতন্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিতে!
সদ্‌গুরুগণ জগতে আসিয়া
মুহুর্মুহু দেহবোধ বিস্মৃত হইয়া,
সমাধি মাঝারে ডুবি আপনার

চিন্ময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—
ক্ষণপরে সে সমাধি হতে ব্যুত্থিত হইয়া
ভক্তগণ সনে সহজ সরল মনে
ধর্মকথা করেন আলাপন!
এ অপূর্ব দিব্যভাব হতে "অবতার" বলি
তাঁরা পরিচিত হন এ জগতে।
সামান্য মানব আর যুগ-অবতারে
পার্থক্য এখানে—এ পার্থক্য হেরি
"পরমপুরুষ" বলি পরিচিত হন
তাঁরা ভক্তজন মনে!

বানরটুপি

এবারের পৌষের প্রচণ্ড শীতে—
"বানরটুপির" সমাদর হেরি চারিভিতে!
পথবাহি চলিয়াছে যত পথচারী
সকলের শিরে শোভে বিচিত্র বর্ণের
বানরটুপির মেলা কত রকমারি।
বানরের সর্বদেহ পশমে আবৃত—
শুধু তার মুখখানি পশম বর্জিত!
পশম টুপির মাঝে মানুষের মুখ—
দেখিলে মনেতে জাগে বানরের রূপ।
এ কারণে বুঝি ওই পশুদের
নাম অনুসারে—এ বিশেষ
টুপিগুলি পরিচিত দেশের
মাঝারে।
রূপহীন এই টুপি গুণ লাগি সমাদৃত
জগতের কাছে—গুণের আদর
এ জগতে চিরদিন আছে।

পশম

কার্পাস বৃক্ষের ফল হতে
সৃষ্টি হয় কার্পাস সুতার—
সেই সুতা হতে মনুষ্য বুদ্ধিতে
ক্রমে হয় বস্ত্র আবিষ্কার!
এই বস্ত্র সৃষ্টি হতে
মানব সমাজে হয় ধীরে ধীরে
সভ্যতা প্রসার—
আজিকার বস্ত্রশিল্প প্রমাণ তাহার।
অনুরূপ ভাবে শীতের প্রভাবে
শীতের দেশেতে হয় পশম তৈয়ার
বন্য-পশু লোম হতে মানব বুদ্ধিতে
হল পশমের আবিষ্কার।
শীতঋতু ভরি সারা দেশ জুড়ি
কত না বিচিত্র পশমের পোশাকের মেলা—
প্রচণ্ড শীতের সাথে যুঝিতে সক্ষম
একমাত্র পশমের বস্ত্র আর
পশম-নির্মিত শয্যাগুলা!
বৎসর ভরিয়া হয় ষড়ঋতু-চক্র আবর্তন—
বিভিন্ন ঋতুতে জীবের জীবন বাঁচাইতে
সৃষ্টিকর্তা বিধাতার কত না
বিচিত্র আয়োজন!
বিধাতার এই কৃপা স্মরণে রাখিয়া—
মানুষেরা পূজে তাঁরে কৃতজ্ঞ অন্তরে,
ফুলে-ফলে গঙ্গাজলে
বৎসর ভরিয়া!

তুচ্ছ তবু তুচ্ছ নয়

বধূ-মা সাহানা সহসা একদা
পরম আগ্রহ ভরে দিল মোরে আনি—
পিঠ-চুলকানোর তরে
খেলনার "হাত" একখানি!
সস্নেহ কৌতুকে লইলাম উহা আমি—
কিন্তু প্রয়োজন তার তখন বুঝিনি।
কিছুকাল পরে এক গ্রীষ্মের দুপুরে
সহসা যখন—পিঠ-চুলকানোর
হল বড় প্রয়োজন,
বধূ-মা'র দেওয়া সে-হাতের কথা
মনে মোর জাগিল তখন।
দ্রুতপদে গিয়া সে "হাত" লইয়া
পরম আগ্রহে ব্যবহার করি পুনঃপুন—
অতি তুচ্ছ সেই উপহার আজ
মনে হল মোর কাছে বন্ধু প্রিয়তম।
বুঝিলাম মনে সঙ্কটের ক্ষণে
উদ্ধার করিতে যে বা পাশে আসি মিলে—
তাহারেই বন্ধু বলি মানেন সকলে।
বধূ-মা'র উপহার অতি তুচ্ছ খেলনার
মূল্য সেইদিন পারিনি বুঝিতে—
প্রয়োজন ক্ষণে আজ অনুভবে বুঝিলাম
কী অমূল্য উপহার পাইয়াছি হাতে।
কৃতজ্ঞ অন্তরে সেইক্ষণে বধূ-মা'রে
স্মরি মনে মনে—একান্ত অন্তরে
তার তরে বিধাতার আশীর্বাদ
মাগিয়া লইনু!

একের লীলা

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

বিশ্ব-জগৎ "এক"-এর লীলা
"এক"-এর সনে "এক"-এর খেলা।
সেই "এক"-ই তত্ত্বস্বরূপ—
বিজ্ঞানঘন "এক"-এরই রূপ!
সাধ্য-সাধক-সাধন "এক"-ই—
সিদ্ধিও সেই "এক" স্বয়ং-ই
অন্তর বাহির "এক"-এর সৃষ্টি—
সর্ব কর্ম "এক"-এরই কীর্তি।
জগৎময় "এক" যে নিজে—
সংসারময় "এক"-ই বিরাজে।
সাধক-মনের চিন্তা-ধ্যানে—
"এক"-এরই প্রকাশ হয় সেখানে।
"নির্বিকল্প সমাধি" যাহা
"এক"-এরই প্রকাশ—"এক"-ই তাহা।
অবতার রূপে আসেন যিনি—
"এক"-ই স্বয়ং "এক"-ই তিনি!

চাবির রিঙ

বধূ সাহানার দেওয়া উপহার
"ঘোড়ার মাথা"-র রিঙ—
সে রিঙের চাবি ব্যবহার করি
সকলেই প্রতিদিন।
উঠিতে বসিতে আলমারি খুলিতে
দ্রুতপদে ছুটি চাবি-রিঙ হাতে
প্রতিদিন শতবার—

দেরাজ হইতে চাবি-রিঙ লয়ে
খোলা হয় বার বার।
অর্থ-মূল্যে অতীব তুচ্ছ
রূপহীন অতি দীন—
প্রয়োজন কালে বুঝিনু সকলে
নহে উহা কভু হীন।
ভাবি মনে তাই তুচ্ছ কিছু নাই
এই বিশ্বের মাঝে—
তুচ্ছ বলি মোরা হেলা করি যাহা
তারও প্রয়োজন আছে।
স্মরি বধূ-মা'রে আশিস দিলাম
উজার করিয়া প্রাণ—
দেবতা-চরণে বধূ-মা'র তরে
কল্যাণ মাগিলাম।

মীনাক্ষি

বাবা-মায়ের স্নেহের মেয়ে
মীনাক্ষি নাম তার—
দেখলে তারে প্রাণে জাগে
আনন্দ অপার।
একটি মাত্র সন্তান সে
সবার আদরের—
কোলে-পিঠেই হল ক্রমে
তিনটি বছরের।
বাবার কোলে বসে বসে
শিখলো অ-আ, ক-খ—
মনে রাখার শক্তিতে তার
নেইকো জুড়ি কেহ।

আদর করে মা তাহারে
ডাকেন "তুলতুলি"—
কচি মুখে বেরোয় যে তার
পাখির মতন বুলি।
বিশটি বছর না-পেরোতেই
শেষ করল পড়া—
বিদ্যা-বুদ্ধি-অঙ্কনেতে
অবাক করল পাড়া।
বাবা-মা তার বিয়ে দিলেন
পরম সোহাগ ভরে—
সুশিক্ষিত কর্মরত
পার্থ সেনের ঘরে।
ওই বয়সেই বধূ হয়ে
এল শ্বশুর ঘরে—
করল বরণ শ্বশ্রূমাতা
বধূ তুলতুলিরে।
শ্বশুর তাহার ছিল নাকো
গেছেন স্বর্গধামে—
ফটো দেখেই বধূর চক্ষে
অশ্রুধারা নামে।
শাশুড়িরে সেবা করে
পরম যত্ন ভরে—
আত্মীয়দের তুষ্ট করে
মিষ্ট ব্যবহারে।
ক্রমে ক্রমে তিনটি বছর
কাটল শ্বশুর ঘরে—
একটি কন্যা জন্মাল তার
ভগবানের বরে।
কন্যা পেয়ে তুলতুলি যে
আনন্দে মাতিল—
শাঁখের রবে বাড়ির সবে
কন্যা বরি নিল।

নাসিকা-বান্ধব

চেন কি তোমরা সবে
মোর "নাসিকা-বান্ধবে"?
হেসো নাকো তবে—
চেনাব তাহাকে।
শোন, তবে তার পরিচয়—
অতিশয় তুচ্ছ সে যে,
তবু তুচ্ছ নয়!
বিপদের কালে যে বা পাশে আসি
মিলে—বন্ধু তারে বলে,
বন্ধু সে নিশ্চয়ই!
অনুরূপ হেরি এই ক্ষুদ্র বন্ধুটিরে—
বিবরণ কহি ধীরে ধীরে।
নাসিকার শ্লেষ্মা-জল
ঝরে যবে অবিরল—
রোধিবার সাধ্য নাহি হয়,
"নাসিকা-বান্ধব" আসি
ঘৃণা নাহি বাসি
নিজ দেহে উহা মুছি লয়!
যতদিন প্রয়োজন হয়—
নির্বিচারে ধৈর্য ধরে সঙ্গে সঙ্গে রয়,
নাসিকা-নির্গত কফ-শ্লেষ্মা আদি যত
নিজ দেহে সব মুছি লয়,
ঘৃণা করিবার তার
নাই যে সময়!
বিচার করিয়া কহ তোমরা সকলে,
"নাসিকা-বান্ধব" তারে
বলে কি না বলে?
আমার বিচারে সে-ই
বন্ধু সর্বোত্তম—
আর কারে নাহি হেরি
বন্ধু তার সম!

বৃক্ষের ক্রন্দন

তোমরা কি শুনেছ কখনও
বৃক্ষের ক্রন্দন?
বাগানের মাঝে পুষ্পবৃক্ষে হেরি
পুষ্প চয়নের তরে গিয়াছ যখন—
কখনও কি শোন নাই
তাদের রোদন?
শোন তবে দিয়া মন—
আমার জীবনে এমন ঘটনা
ঘটে সর্বক্ষণ, প্রতিদিন পুষ্প-চয়নের
তরে পুষ্পবৃক্ষ ধারে গিয়াছি যখন!
তাদের নিকটে গেলে শাখা-বাহু মেলে
জড়াইয়া ধরে তারা আমারে তখন—
বলে, "মাগো, জল দাও মোরে
তৃষা-নিবারণ তরে, তৃষিত রয়েছি আমি
ধরি বহুক্ষণ, শীঘ্র কর জল দানে
তৃষ্ণা নিবারণ!"
মানুষ আমরা—চিন্তাশক্তি আছে
আমাদের—ভাবিয়া কি দেখ না কখনও
সর্বপ্রাণী হৃদয় মাঝারে বিরাজেন
আত্মা-রূপে একই "নারায়ণ"?
ঘটে-পটে সর্বক্ষণে ফল-পুষ্প-পত্র দানে
গৃহকোণে পূজি নারায়ণে—
নিজ নিজ সংসারের সুখ-শান্তি তরে
প্রার্থনা জানাই মনে মনে।
এই মহাবিশ্ব জুড়ে অন্তরে-বাহিরে
বিরাজেন সমভাবে চেতনা-রূপেতে
নারায়ণ—তাঁহারে হৃদয়ে বরি,
সর্বপ্রাণ মাঝে হেরি,
সমভাবে সর্বপ্রাণে করিলে গ্রহণ,
তবে হবে যথার্থই তাঁহার পূজন,

সার্থক জানিবে এই
মনুষ্য জনম!

মনের মানুষ

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার "মনের মানুষেরে"!
সে যে দেয় না ধরা, হায়,
পালিয়ে বেড়ায়—
হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার
পলকে মিলায়!
সারা জীবন ধরে, খুঁজে বেড়াই তারে-
খুঁজে নাহি পাই,
চোখের দেখা দিয়ে কভু
তখনি মিলায়!
দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হল
দেহ হল ক্ষীণ—
ভেবে ভেবে সেই মানুষে
পেলাম না তার চিন।
জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
আঁধার এল ঘিরে—
স্মরণ করি বারে বারে
"মনের মানুষেরে"।
হঠাৎ জ্যোতির বন্যা নামি
এল চারিধারে—
তারই মাঝে পেলাম খুঁজে
"মনের মানুষেরে"।
চেষ্টা করে প্যাইনি যারে
সারা জীবন ভরে—

আপনা হতে দিল ধরা
নিল বরণ করে
আপন হৃদয়পুরে-
ধন্য করি মোরে!

গঙ্গামণি

ছোট্ট খুকি গঙ্গামণি
মিষ্টি তাহার স্বভাবখানি
মায়ায় ভরা চক্ষু দু'টি তার—
সারাদিনের কাজের ফাঁকে
চোখ দু'টি যে আমায় ডাকে
সে চাহনি ভুলে থাকাই ভার!
জন্ম তাহার গ্রামের ঘরে
গ্রাম ছেড়ে এল শহরে
বাবা-মায়ের সঙ্গ ছেড়ে একা—
শান্ত চোখের তারায় আঁকা
সেই বেদনার রেখা!
কাজের তরে মোদের ঘরে
মামা নিয়ে এলেন তারে
আজই সকাল বেলা—
আমার খোকন পেয়ে তারে
উৎসাহে আনন্দ ভরে
জুড়ে দিল খেলা।
সাথী পেয়ে খোকনেরে
গঙ্গামণি ধীরে ধীরে
ভুলল মনের ব্যথা—
ফুটল কচি মুখেতে তার
শান্ত হাসির রেখা।

একটু বেলা হতে হতে
চলল খোকন ইস্কুলেতে
গঙ্গামণি আবার হল একা—
কাছে ডেকে ধীরে ধীরে
বুঝাই তারে কোমল স্বরে
ফিরবে খোকন একটু পরে—
লাগবে না আর ফাঁকা।
ভাবি আমি মনে মনে,
দুঃখ-কষ্টে এ দুর্দিনে
বাবা-মা তাঁর শিশুটিকে
পাঠালেন এখানে—
খুকির মনের গোপন ব্যথা
বাবা-মায়ের সমানই তা
উপায়হীনের দুঃখ
কেবা জানে?
যদি আমি এই খুকিকে
মিষ্টি কথায় আদরেতে
রাখি সদা আমার কাছে কাছে—
হয়তো কিছু দিনের পরে
মনের ব্যথা ভুলতে পারে
এইটুকু মোর ভরসা মনে আছে।
যথাসাধ্য চেষ্টা করে
পারব না কি ধীরে ধীরে
মুছাতে তার মনের গোপন ব্যথা—
ভগবানে মনে রেখে
পারব না কি দিতে তাকে
শান্তির স্নিগ্ধতা?

কে তুমি?

কে তুমি ধরায় এলে,
এই ঘোর কলিকালে
বিদূরিতে কলির আঁধার—
"তত্ত্বালোক" বিকিরণে
উদ্ধারিতে জনগণে
তত্ত্বজ্ঞান করিতে প্রচার?
পারেনি চিনিতে তোমা
মোহঘোরে অন্ধ জনগণ—
পশেনি শ্রবণে তাহাদের
জননীর শ্রীমুখের "সানাই রণন,"
অভিনব "একের মন্ত্রধ্বনি" হৃদি মাঝে
তোলেনি গুঞ্জন!
অকালে রোপিত বীজ
অঙ্কুরিত হবে না এখন—
কাল পূর্ণ না হইলে
তত্ত্বজ্ঞান-বীজ উপ্ত হবে না কখনও,
কলি-জনগণের অন্তর রহিয়াছে
অনুর্বরা মরুর মতন!
"সানাই"-নির্গত তত্ত্বজ্ঞান-বীজ
অঙ্কুরিত হবে ভাবীকালে—
ভাবী প্রজন্মের জ্ঞানিগণ
লভিয়া সুফল ধন্য হইবে সেকালে।
তব আগমন সার্থকতা লভিবে তখন!
কলিযুগ অবসান তরে
আগমন তব এ সংসারে।
তত্ত্বের আলোকরশ্মি অতি ধীরে ধীরে
প্রবেশ পাইবে মুষ্টিমেয়
জ্ঞানীর অন্তরে—
যাঁহারা ব্যাকুল আজি কলির
আঁধার হতে মুক্তি লভিবারে।
যুগ-প্রয়োজনে আগমন তব এ ধরায়—

"তত্ত্বালোক" বিকীর্ণ করিয়া
কলির কালিমা বিদূরিয়া
সত্য-প্রতিষ্ঠায়,
নবীন যুগের সূচনায়,
সার্থক করিতে ধরণীরে নিজ মহিমায়!

বাণী-বন্দনা

পরমা প্রকৃতি তুমি, তুমিই প্রকৃতি-পতি,
দেবী সরস্বতী,
অনন্ত একের বক্ষে একেরই লীলায়
উঠেছ ফুটিয়া আজি শ্রীপঞ্চমীর
পুণ্যক্ষণে এই ধরায় ধুলায়!
বিতরিয়া আত্মজ্ঞান ঘুচাইতে মোহঘোর
কলি-সমাচ্ছন্ন তব অবোধ সন্তানে—
জ্ঞানমূর্তি মাতা, তুমি অবতরি
আসিলে ভুবনে!
অপার কৃপায় আসিলে ধরায়—
জ্ঞানালোক দানে অজ্ঞান সন্তানে
উদ্ধার আশায়!
"সানাই বাঁশরি"-রূপে আসিলে মরতে—
"অভেদ-মন্ত্রের" নির্ঘোষণে
পরম সত্যের জ্ঞানদানে
বিশ্ববাসী জনে উদ্ধারিতে!
তব পুণ্য আগমন জগৎ-কল্যাণে
কলিযুগ অবসানে—
পরম সত্যের প্রতিষ্ঠায়
সত্যযুগ সূচনায়!

৬-২-২০০৩
বৃহস্পতিবার, শ্রীপঞ্চমী (সকাল)

বাঘের দেশে

দক্ষিণ বাংলার প্রান্তে সমুদ্রের তটে
সুন্দরবনের এক ব-দ্বীপ ভূমিতে
"সজ্‌নেখালি" বনে—
গেলাম একদা মোরা আনন্দ-ভ্রমণে।
বাড়ি হতে রেলপথে ক্যানিং-এ নামিয়া
স্টিমারে চড়িয়া গোসাবায় আসি
হোটেলে আহার সারি
সাতজোলিয়ার ভুট্‌ভুটিতে চড়ি—
দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করি অবশেষে
অপরাহ্ণে আসিলাম পিচ্‌খালি গাঙের
কিনারে—সজ্‌নেখালি বন দপ্তরে!
আমাদের পরিচিত পুরোহিত দক্ষিণারঞ্জন
করেন মোদের তরে এই ভ্রমণের আয়োজন-
তাঁর পরিচিত বন্ধু বন বিভাগের কর্মী
রঞ্জিত রায়ের আবাসনে।
ভুট্‌ভুটি হইতে নামি দীর্ঘ "জেটি" বাহি
বাড়ির সীমায় আসিলাম—
গরানের ডালে গাঁথা বেড়ার ভিতরে
আসি কিছুদূর হাঁটি রঞ্জিতবাবুর
সেই বাড়ি দেখিলাম।
কাঠের তৈয়ারি ভিন্ন ভিন্ন ঘর তিনখানি—
প্রতিটি তাহার রহিয়াছে সুউচ্চ কাঠের
খুঁটির উপরে পাটাতনের মাঝারে,
উচ্চ সিঁড়ি পথে উঠি প্রবেশ
করিতে হয় সেই সব ঘরে।
বাহির বাড়িতে প্রথম ঘরটি রহিয়াছে সুনির্দিষ্ট
সরকারী অফিস-কর্ম নির্বাহের তরে—
অন্য ঘর দুইখানি রঞ্জিতবাবুর

পরিবার পরিজনগণে
ব্যবহার করে।
বাড়ির পিছনে কিছুদূরে খুঁটির উপরে
উচুঁ "মাচাঘর" আছে
বন্য প্রাণী দর্শনের তরে।
তারপরে রহিয়াছে "মিঠা জলের"
পুকুর—বর্ষার জলে উহা
থাকে ভরপুর।
বন্য পশু-পাখি আসি এই জলে তৃষ্ণা
করে দূর। কটু-লবণাক্ত জল যাহা
এই সুন্দরবনের সর্বত্রই আছে—
পানের অযোগ্য তাহা
প্রাণীদের কাছে।
রঞ্জিতবাবুর ঘরে রান্না ও পানের তরে
জল আসে নদীপথে শহর হইতে
জালা ভরে।
মিঠা-জল পুকুর হইতে দূরে দেখা যায়
"সুন্দরী গাছের" ঘন বন—
সেই সব বনে সরকারের কর্মচারিগণে
মশাল লইয়া যায় সরকারের তরে
মধু আহরণে
বাঘের হিংস্র আক্রমণ আশঙ্কায়
বনপথে তারা মুহুর্মুহু পটকা ফাটায়—
ভীষণ বাঘের আক্রমণ হতে
সকল সময়ে তাহে রক্ষা নাহি পায়।
রঞ্জিতবাবুর ব্যবস্থায় একদিন সকলে মিলিয়া
নদীপথে স্টিমারে চড়িয়া ঘুরিলাম
সারাদিন আনন্দে মাতিয়া
অরণ্য দেখিয়া।
রাজসিক আহারের ব্যবস্থায় পরিতুষ্ট
হইল সকলে ভ্রমণ করিয়া।

দীর্ঘ পাঁচ দিন ধরি সুন্দর বনেতে বাস করি
মিলিল না আকাঙ্ক্ষিত বাঘের দর্শন—
অবশেষে ফিরিলাম বাড়ি
শেষ করি আনন্দ-ভ্রমণ!

গুরুশক্তি

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

আনন্দঘন যে-মহাচৈতন্য
বেদনার সুতীব্র আঘাত হানি
করি দেয় প্রসারিত
আপন হৃদয়কেন্দ্র অভিমুখে
মানবের সঙ্কুচিত প্রাণ—
তিনিই হৃদয়কেন্দ্রে বিরাজিত
গুরুশক্তি-রূপী ভগবান!
নিত্যাদ্বৈত নির্গুণ-গুণী প্রজ্ঞানাত্মা গুরুশক্তি
ব্যষ্টি-জীবনেরে সার্থক করিতে
মহাপ্রাণ-চৈতন্যের স্বরূপে মিলাতে—
আপন শক্তিতে টানি কেন্দ্র-অভিমুখে
করি তোলে গুরু গরীয়ান্,
এই গুরুশক্তি অন্তরে-বাহিরে স্থূল-সূক্ষ্মে
সর্বত্রই নিত্য সমভাবে আছে বিদ্যমান!
দীক্ষা গ্রহণের পরে নির্দিষ্ট সাধন-পথে
নিষ্ঠা সহকারে চলিতে যে পারে—
সেই শিষ্যে গুরু তাঁর সাধন-বিজ্ঞান
দানে কৃপাধন্য করে।
গুরুশক্তি তখনই স্বয়ং প্রবেশিয়া সন্তানহৃদয়ে
হন তাহার সহায়—যদি শিষ্য দীক্ষার প্রথম
হতে শেষ অবধি রত থাকে ধৈর্য-স্থৈর্য

সহিষ্ণুতা সহ সাধনায়,
অপার নিষ্ঠায়!
সেই শিষ্য যথার্থই গুরু কৃপা আর
গুরুশক্তি লভিবার যোগ্য অধিকারী—
সাধনায় সিদ্ধি লাভ করি অবশেষে
করেন সার্থক আপন জীবন
অপার আনন্দ আর
শান্তি লাভ করি!

মায়ের আহ্বান

মায়ের আহ্বান বাণী
শুনিবার আশে—
উৎকর্ণ হইয়া আছি বসে!
শীতের বিশুষ্ক পত্র
মর্মরে বাতাসে—
চমকিত হয়ে ভাবি
সে আহ্বান আসে।
বসন্তের সুস্নিগ্ধ হাওয়ায়—
মা'র বাণী কানে ভাসি
আসে পুনরায়।
আশায় আনন্দে কাটে
এক একটি দিন—
প্রতিটি প্রভাত আসে
হইয়া রঙিন!
প্রভাতের আশা যবে লীন হয়ে যায়-
অপরাহ্নে সে আহ্বান তরে
নব আশা জাগে পুনরায়!

অপরাহ্ণ বহি গেলে রজনীতে
সুপ্তি-ঘোরে মায়ের আহ্বান তরে
উঠিনু চমকি—স্বপ্ন বলি বুঝি
যবে নিরাশার অনুভবে অশ্রুবন্যা
দৃষ্টি রাখে ঢাকি!
দিবালোকে জাগি অন্তরের তলে
অনাগত আহ্বান আসার অর্থ
সুস্পষ্ট হইল—জানিলাম
এই আশা ভরে মন মোর
মায়ের চরণ 'পরে রবে
চিরস্থির চিরদিন তরে!

মহাবিশ্ব

(স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত
বাণীর অনুসরণে রচিত)

বোধে বোধে বোধময়
পরমাত্মা নিরঞ্জন পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম
অখণ্ড ভূমা—
মগ্ন হয়ে লীলায় আপন
রূপে-নামে-ভাবে-বোধে
প্রকাশেন আপনাকে বিস্তারিয়া
আপন স্বরূপ আপনার স্বভাব
মহিমা!
বোধ ও মনের যোগে
বিষ্ণু-ভগবান রূপে আপন ইচ্ছারে
রূপ দিয়া—সৃজন করেন এই
মহাবিশ্ব চরাচর আপনার
সম্ভোগ লাগিয়া।

রূপ আর নামের মিলনে
বহির্বিশ্ব হইল সৃজিত—
বহিঃপ্রকৃতি রূপে যাহা
আছে প্রকাশিত।
রূপ-নাম-ভাব তিনে
মিলিত হইয়া জীবরূপে রহিয়াছে
জগৎ ব্যাপিয়া।
ঈশ্বর জীবের স্রষ্টা পুরুষ মহান—
জীবগণ ঈশ্বরের "প্রকাশ সন্তান"
সকল জীবনই হয় প্রতিমা তাঁহার—
তিনি ভিন্ন কেহ কিছু নাই
কোথা আর।
সৃষ্টির কারণ আর নিমিত্ত-কারণ,
মূল উপাদান যাহা সবই তিনি হন।
তিনিই সত্তা-শক্তি পুরুষ-প্রকৃতি—
স্ববোধে পুরুষরূপ স্বভাবে প্রকৃতি।
এ যুগল রূপ তাঁর একক রূপেরই
দ্বিবিধ অভিব্যক্তি!
আপন ইচ্ছায় বিস্তারিয়া আপনায়
রূপে-নামে-ভাবে-বোধে
মহাবিশ্ব রূপে—
সম্ভোগ করেন নিজ লীলায়িত রূপ
ক্ষণকাল তরে।
সম্ভোগের শেষে আপন আনন্দে
পরিতৃপ্ত হয়ে—
আপন ইচ্ছায় পুনঃ
আপন বিস্তৃত রূপ করি সম্বরণ
করেন গ্রহণ বোধে বোধে
বোধময় পরব্রহ্ম স্বরূপ
আপন!

বর্ষ বিদায়

চৈত্র হল অবসান—
সুদূরের পার হতে শুনি
নব-বৈশাখের পদধ্বনি,
সূচিত করিয়া নব বৎসরের
আগমনী!
বিগত বর্ষের ভালো-মন্দে
মিলিত জীবন—
আনন্দ-বেদনা যত
জগৎবাসীরা হাসিমুখে
করেছে গ্রহণ।
নববর্ষ আসিছে ধরায়—
পুরাতন বৎসরেরে
জানাতে বিদায়।
এ জগতে চিরস্থায়ী নহে কিছু
নহে কোনও জন—
আসা আর যাওয়া
এক সূত্রে গাঁথা দুইজন!
নবীন বৎসর নব আনন্দের মাঝে
প্রবেশ লভিবে এ ধরায়—
পুরাতন বৎসরের বিদায়-বেদনা
ভুলিবে সবাই।
নবীনেরে বরি' আনন্দ-উৎসবে
মাতিবে জগৎ নবীন আশায়!
বর্ষে বর্ষে একই চিত্রপট
দেখা যায়—
পুরাতন যায় চলি
নবীনেরে রাখিয়া সেথায়।
বিধাতার সৃষ্টিলীলা
একই ধারা বাহি
চলে এ ধরায়!

মিতালি

বধূমা মিতালি এল
মোদের ভবনে—
আনন্দে পূরিল প্রাণ
তাহার দর্শনে।
সরল স্বভাব আর
মিষ্ট ব্যবহারে
পর কি আপন
সবে ভালোবাসে তারে।
বহুদিন পরে আজ
পেয়ে বধূমারে
সকলে ঘিরিয়া বসি
মহানন্দ ভরে।
হাসিমুখে বধূমাতা
কত গল্প করে—
একে একে সকলেরে
সম্ভাষে আদরে।
মাসি দু'জনেরে দিল
অনুপম শাড়ি দুইখানা—
মিতালির ভালোবাসা
হয় না তুলনা।
সারাদিন কেটে গেল
মহানন্দে খাওয়া-দাওয়া
হাসি-গল্পে মাতি—
মধুময় হল প্রাণ
পেয়ে তারে সাথী।
আজিকার এ দিনটি
ভুলিবার নয়—
বধূমা সবার প্রাণ
করে নিল জয়।

দোলামণি

মোদের প্রিয় বেলাদিদির
বড় ছেলে ভোলা—
ভোলার যখন মেয়ে হল
নাম হল তার দোলা।
দিনে দিনে বাড়ে দোলা
যেন চাঁদের কলা—
কচি মুখের মিষ্টি হাসি
যায় না যে তা ভোলা।
হামা দিতে শিখল ক্রমে
ছোট্ট দোলামণি—
তাই না দেখে মা-ঠাকুমার
ভরল যে প্রাণখানি।
হাঁটতে যবে শিখল দোলা
টল্‌মলিয়ে ধীরে—
বাবা-মা আর ঠাকুমায়ের
আনন্দ না ধরে।
মায়ের কোলে বসে বসে
শিখল অ-আ, ক-খ
এ বয়সে বুদ্ধিতে তার
নেইকো জুড়ি কেহ।
আজকে দেখি সেই দোলাকে
ষোড়শী রূপসী—
বিদ্যাবুদ্ধি স্বভাব গুণে
মুগ্ধ প্রতিবেশী।
মোদের বাড়ি এল দোলা
বাবা-মায়ের সনে—
পেয়ে তারে মোদের সবার
কী আনন্দ প্রাণে।
হাসি-খুশি গল্পে মেতে
কাটল মোদের দিন—

নবীন প্রাণের পরশ পে
মন হল নবীন।

সায়রী

সাগর অতল হতে তুমি
উঠলে সায়রী—
তোমায় দেখে মনে জাগে
সাগর-পরী!

মিষ্টি মুখের দুষ্টু হাসি
ভুলতে না পারি—
কাজের ফাঁকে ফাঁকে সদাই
ও মুখ নেহারি।

কবে তুমি আসবে আবার
মোদের এ বাড়ি—
আবার কবে দেখবো ও-মুখ
তাই ভেবে মরি!

সায়রী তো সাগর-পরী
ডানা আছে দু'টি—
উড়ে উড়ে সদাই তুমি
বেড়াও ছুটি ছুটি।

তবে কেন পাই না দেখা
কেন দুঃখ পাই—
আমার তরে ভালোবাসা
তোমার মনে নাই?

নাই বা মোরে বাসলে ভালো
কিবা তাতে ক্ষতি—
তোমার মুখটি ভেবে ভেবে
কাটাই যে দিন-রাতি।

সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে
যখন গিয়ে বসি—
তখনই মোর মনে পড়ে
মিষ্টি তোমার হাসি।
দেবতারে তোমার তরে
মিনতি জানাই—
চিরসুখী করুণ তোমায়
আর কিছু না চাই!

নীতা

মিতা-নীতা দুইটি বোনের
দেগঙ্গায় বাড়ি
বিয়ের পরে এলো দু'জন
দেগঙ্গা ছাড়ি।
শ্বশুরবাড়ি দু'জনারই
কোলকাতা শহরে—
একই পাড়ায় কাছাকাছি
বাড়িতে বাস করে।
নীতার একটি কন্যা হল
দুইটি বছর পরে—
কন্যা পেয়ে নীতার মনে
আনন্দ না ধরে।
ডাকনাম তার "তিন্নি" হল
"সায়রী" পোশাকি—
সাগর তলের পরী যে এক
উঠে এল দেখি!

দিনে দিনে বাড়ে তিন্নি
চাঁদের কলার মত—
নীতার বুকের অগাধ স্নেহ
তার তরে সতত।
মা ও মেয়ের ভালোবাসার
তুলনা কোথায়?
একটি মাত্র কন্যা সে যে
আর তো কেহ নাই!
তিন বছরে পড়ল যবে
নীতার স্নেহের মেয়ে—
"হাতে খড়ি" হল তাহার
পরম উৎসাহে।
নীতা তারে কোলে করে
শিখায় অ-আ, ক-খ
শিখতে বসে কী আনন্দ
দেখেনি তো কেহ।
নীতার দিদি মিতা যবে
আসে ওদের বাড়ি
তিন্নি ছোটে সবার আগে
খেলাধুলা ছাড়ি।
মাসির সাথে মহানন্দে
গল্পেতে যায় মেতে—
সারাটা দিন কাটে যে তার
মাসির আদরেতে।

এবারের "শ্রীম"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন
নররূপী নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণেরে—
শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনলীলার
শুধুমাত্র শেষ চারি বৎসরের তরে।
শ্রীরামকৃষ্ণের যত দিব্যবাণী
শুনিতেন তিনি তাঁর শ্রীমুখ হইতে—
সুগোপনে রাখিতেন সংগ্রহ করিয়া তাহা
আপনার দিনলিপিকাতে।
মর্ত্যধাম ত্যজি যবে গেলেন ঠাকুর নিত্যধামে—
তার বহু পরে ছদ্মনামে প্রকাশেন
তাঁর কিছু বাণী বিদেশি ভাষাতে,
দুঃসাহস ভরে।
সেই দিব্যবাণী পাঠে বিমুগ্ধ স্বামীজি
দানিলেন "লক্ষ সাবাস" মহেন্দ্রনাথেরে
অনুরাগ ভরে।
আরও বহু পরে শ্রীমা সারদার
সম্মতি পাইয়া—প্রকাশেন একে একে
"কথামৃত" নামে তিন খণ্ড ঠাকুরের দিব্যবাণী
সাহস করিয়া।
অবশেষে বৃদ্ধ বয়সেতে চতুর্থ খণ্ডের
প্রকাশ হইল—তাঁর দেহত্যাগ
হইবার পরে সর্বশেষ পঞ্চম খণ্ডের
প্রকাশ ঘটিল।
শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গল ইচ্ছায়
এইরূপে তাঁর দিব্যবাণী যত—
"কথামৃত" গ্রন্থরূপে শ্রীম'র মাধ্যমে
হইল গ্রথিত।
দ্বাপরের শ্রীগীতার সম অনুপম
নবগীতা "কথামৃত" পাঠে
ধন্য হল কলিজনগণ।

এবারের "শ্রীম" রূপে আসেন জগতে
বাণীমাতা—যাঁহার মাধ্যমে
লভিল জগৎবাসী শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের
অধ্যাত্মজীবনী-রূপ মহাগ্রন্থ
"স্মৃতিগাঁথা"।
বাণীমা লভিয়াছেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের পূত সঙ্গ
দীর্ঘ ত্রিংশ বৎসর সময়—
সেবিয়াছেন তাঁহারে পুত্রসম স্নেহে
ভুলি আপনায়!
বিশ্বজননীর শ্রীমুখের "সানাই"-এর মতো
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে অবিরত
উচ্চারিত হত ভগবৎ তত্ত্ব যত
গীত আর বাণীর মাঝারে—
সে সকলে সাধ্যমত নিষ্ঠা আর ধৈর্য সহকারে
করেন সংগ্রহ তিনি দীর্ঘকাল ধরে।
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শুভ-ইচ্ছা ক্রমে
বাণীমার অক্লান্ত চেষ্টায় আর
অসীম ধৈর্যেতে—
প্রকাশিত হল অতুলন "স্মৃতিগাঁথা"
এ-ঘোর কলিতে!
অনুপম এই গ্রন্থ পাঠে বিশ্ববাসী
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বরূপ জানিবে—
তাঁর প্রকাশিত অধ্যাত্মবিজ্ঞান রূপ
সনাতন বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হবে।
যুগ প্রয়োজনে বিশ্বমাঝে যুগোপযোগী ভঙ্গিতে
সনাতন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রকাশিতে
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের আগমন কলিশেষে
এই ধরণীতে।
মুষ্টিমেয় কতিপয় শুভ-সংস্কারের অধিকারী শুধু
এই নব-বিজ্ঞানের মর্ম অবগত হবে—
তাঁহাদের দ্বারা অতি ধীরে ধীরে
অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিশ্বময় প্রচার লভিবে।

এইরূপে দীর্ঘকাল পরে
কলিযুগ-রূপ "কলি পরিপূর্ণ পুষ্পের
আকারে বিকশিত হবে"—
যাহার সুবাস-রূপে "ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ
সারদা জননী আর বিবেকানন্দ হেন
দিব্যমহাজীবনের আগমন হবে।"

অপরাজিতা

সবুজ লতার বুকে ঘননীল
অপরাজিতা ফুলগুলি
প্রভাত সমীর স্পর্শে
উঠিতেছে দুলি।
রবির কিরণে স্নাত হয়ে
অপূর্ব বিভায়,
নিবেদন করিছে নিজেরে
দেবতার পায়ে!
গন্ধহীন এ-কুসুম
সুগন্ধ পুষ্পের দলে
চিরপরাজিতা—
নামের গরব বহি রহে লজ্জানতা।
শ্বেত আর কৃষ্ণ এই দ্বিবর্ণ অপরাজিতা
জন্মে ধরা 'পরে—
রূপে-গুণে দীন তবু
এই নাম কে দিল তাহারে?
গোলাপ চম্পক আদি
পুষ্পদল রূপে-গুণে চিরসমাদৃতা—
রূপহীন গুণহীন কুসুমটি

অভিনব এই নামে
কেমনে হইল পরিচিতা?

শ্রীশ্রীদশভুজা বন্দনা

নমো নমো দশভুজা
হিমাদ্রিদুহিতা—
বন্দি তোমা নতশিরে
হয়ে ভক্তিযুতা।
নমো নমো নমো মাতা
শঙ্কর-গেহিনী—
নমো নমো নমো মাতা
গণেশজননী।
নমো নমো নমো মাতা
অসুরদলনী—
নমো নমো নমো মাতা
বিঘ্নবিনাশিনী।
নমো নমো নমো মাতা
ত্রিলোকপালিনী—
নমো নমো নমো মাতা
দুর্গতিহারিণী।
নমো নমো নমো মাতা
জগতকল্যাণী—
নমো নমো নমো মাতা
মোক্ষপ্রদায়িনী।
নমো নমো নমো মাতা
আনন্দরূপিণী—

নমো নমো নমো মাতা
হরবিমোহিনী।

প্রতিমা (১)

ছোট্ট খুকী প্রতিমা
এলো মোদের বাড়ি—
দুর গ্রামের থেকে
নিজের বাড়ি ছাড়ি।
ছোটখাটো কাজ করে
উপার্জনের তরে—
আনলো বাবা ওকে
কাজ করতে মোদের ঘরে;
এলো যবে মোদের ঘরে
বাসলো ভালো সবাই তারে—
চক্ষু দু'টি মায়ায় ভরা
মিষ্টি হাসি পাগল করা।
আলস্য নেই দেহে-মনে
কাজকে সে তার আপন জানে।
সকালবেলা ফুল তুলতে
বাগানে যায় আনন্দেতে।
ফুল এনে সাজি ভরে
কিছুটা নেয় দাদুর তরে।
প্রতিবেশি দাদু-দিদায়
ফুল দিয়ে সে আনন্দ পায়।
সবাই ভালোবাসে তারে
মিষ্টি মধুর ব্যবহারে।
বছর ঘুরে এলো যবে

এবার দেশে যেতে হবে।
বাবা এসে নিয়ে যাবে
বেশ কিছুদিন সেথায় রবে।
যেদিন খুকী গেল চলে
সবার আঁখি ভরলো জলে!

প্রতিমা (২)

প্রতিমার আগমনে
আনন্দে পূরিল প্রাণ—
কত যে বেসেছি ভালো
আজ তাহা বুঝিলাম।
সুদীর্ঘ দিবস-নিশি
কাতরে যারে স্মরেছি
আজ তারে কাছে পেয়ে
ভরেছে যে প্রাণখান।
কিন্তু এ-আনন্দ, হায়,
রবে না তো বেশি দিন—
দু'দিনের পরে মোর
এ-আনন্দ হবে লীন।
আমারে কাঁদায়ে সে যে
যাবে চলে আরবার—
উপায়হীনের ব্যথা
বল, কে বুঝিবে আর!
সুখ-দুঃখ মিলে মিশে
রচিত এ-দুনিয়ায়
চিরদিন সুখ কিংবা
দুঃখে দিন নাহি যায়।

যেটুকু পেয়েছি সুখ
তাতেই সন্তুষ্ট রব—
দুঃখ যবে আসে তা-ও
শান্ত মনে মেনে নেবো।
সন্তোষের মতো ধন
নেই যে জগতে আর—
সহ্যের সমান গুণ
এ জীবনে হয় কার!

মহাপ্রয়াণ

[শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের পরমা সেবিকা এবং "স্মৃতিগাঁথা"
রচয়িত্রী শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তীর
মহাপ্রয়াণ (১০ নভেম্বর, ২০০৩) প্রসঙ্গে]

সেবারূপিণী তপস্বিনী, বাণীমাতা তুমি,
গেলে চলি দেবলোকে নরলোক ত্যজি
আজি পুণ্যক্ষণে—
রাখি গেলে তব সুপবিত্র স্মৃতিখানি
বিশ্বজন মনে।
সুদীর্ঘ জীবন তব কেটেছিল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের
সেবার মাঝারে—
তাঁর পূতসঙ্গ উত্তরণ করেছিল তোমা
স্বার্থমগ্ন সংসার-জীবন হতে
বহু উর্ধ্বে অধ্যাত্ম-জীবনে।
'মহামহামানবের' স্মরণে-মননে-ধ্যানে
কেটেছে তোমার জীবনের
শেষ দিনগুলি—
তাঁরই আশীর্বাদ-ধন্যা হয়ে অবশেষে
আজ গেলে তুমি চলি।

বিশ্বজন তরে রাখি গেলে, মাতা তুমি;
তব জীবনের সার্থক ফসল রূপ
"স্মৃতিগাঁথা"-খানি—
দেব-মানবের পবিত্র জীবনকথা আর
তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাণী!
কলিজনগণ ধন্য হল লভি অমূল্য
এ-মহাগ্রন্থখানি!

বোকা খুকীর কাণ্ড

এক যে ছিল বোকা খুকী
আমাদের এই দেশে—
বলতো কথা সবার সনে
মিষ্টি হেসে হেসে।
পিসীমাকে বাসতো ভালো
সবার চেয়ে বেশি—
দিনেরাতে চেষ্টা ছিল
করতে তাঁরে খুশি।
বাদাম ভাজা আনতো খুকী
পিসী মায়ের তরে—
বাদাম পেয়ে খুশি দেখে
প্রাণটা যেতো ভরে।
পাঁচ টাকাতে একশো বাদাম
সবাই কিনে আনে—
বাজার দরের হিসাব কিছু
খুকী তো না জানে।
দোকানিরে বলে খুকী
ওগো দোকানদার—
পিসীর তরে ভালো বাদাম

চাই যে আজ আমার।
একশো বাদাম দাও আমারে
দিচ্ছি বারো টাকা—
কথা শুনেই দোকানদার
বুঝলো খুকী বোকা!
খুশি মনে এলো খুকী
পিসীমায়ের কাছে—
পিসীর হাতে বাদাম দিয়ে
মিষ্টি হাসি হাসে।
খুশি হয়ে পিসীমা সেই
বাদামগুলি নিল—
গরম বাদাম ভাজা দেখে
কিছু মুখে দিল।
হেসে পিসী শুধান তারে
দাম দিলি রে কত?
খুকী বলে—বারো টাকায়
একশো বাদাম—
তোমার মনের মতো।
জবাব শুনে পিসীমায়ের
চক্ষু হলো স্থির—
বোকা খুকীর কাণ্ড দেখে
প্রাণ হলো অস্থির।

মোদের বেড়াল

[স্নেহের রিমি ও কুটুসের বেড়ালের
অকাল মৃত্যুতে]

বড় আদরের বেড়াল মোদের
"জিম্পি" নামটি তার—

না-দেখিলে তারে জগৎ আঁধার
প্রাণ করে হাহাকার।
সে-প্রিয় জিম্পি সহসা আজিকে
ছাড়ি গেল আমাদের—
অজানিতে তার গলায় বিঁধিয়া
হাড় এক মাংসের।
খেয়েছিল বসে আমাদের সাথে
সানন্দে মাংসের হাড়—
না-জানি কেমনে বিঁধে গেল তার
গলায় একটি হাড়।
সেই থেকে তার অশান্ত আর
অস্থির ভাব দেখে—
বিব্রত মোরা নিয়ে যাই তারে
ডাক্তার সাক্ষাতে।
ডাক্তার দেখে বলেন তখন
এক্স-রে'র প্রয়োজন—
নিয়ে যাও এরে অতি সত্তরে
পশু-চিকিৎসা সদন।
ট্যাক্সিতে চড়ে গেনু সত্তরে
পশু-চিকিৎসাশালা
দাঁড়াইতে হল দীর্ঘ লাইনে
অনেক পশুর মেলা।
এক্স-রে হইল হাড় বাহিরিল
যাতনার অবসান—
অসহ বেদনা সহিতে না-পেরে
জিম্পি ছাড়িল প্রাণ।
বাবা এসে তারে নিল কোলে করে
শ্মশানে গঙ্গাতীরে—
রজনীগন্ধা মালায় সাজিয়ে
কবর দিলেন তারে।
ফটো তুলে তার রাখা হয়েছিল
মোদের সবার সনে—

সেই ফটো দেখে হাহাকার করি
প্রবোধ মানে না প্রাণে।
প্রাণের জিম্পি প্রাণ ছাড়ি গেল
কেমনে সহিব হায়—
জিম্পির শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে
ঘুম-খাওয়া ছুটে যায়।
ভালোবাসা দিয়ে বাঁধি মোরা, হায়,
প্রিয়জনে প্রিয় জীবে—
সে-মায়া বাঁধন সহসা ছিঁড়িলে
মরি যে শোকেতে ডুবে।
মহামায়া তাঁর মায়ার বাঁধনে
সংসারে বাঁধিয়াছে—
মায়া না-থাকিলে জগৎ চলে না
সবই হয়ে যায় মিছে!

মানালির শাল

শারদীয়া অবকাশে পুত্র সনে
বধূমা সাহানা গেল আনন্দ-ভ্রমণে
হিমালয় শৈলকোলে
কুলু আর মানালি দর্শনে।
আনন্দ-ভ্রমণ শেষ করি
যবে এলো ফিরি—
নিয়ে এলো মোদের দু'ভগ্নি তরে
উপহার দুইখানি
মানালির শাল মনোহারী!
গায়ে দিতে সেই মসৃণ-কোমল শাল
উষ্ণ-স্পর্শ তার দিল আনি

দেহে-মনে অপূর্ব আরাম—
তৃপ্ত হয়ে বধূ সাহানারে মনে মনে
অজস্র আশিস দানিলাম।
অর্থমূল্য না-করি বিচার
বধূ সাহানার এই প্রীতি-উপহার
তার হৃদয়ের সুধারসে
অভিষিক্ত করিল মোদের।
আশাতীত এই ভালোবাসা করি নিল জয়
মোদের হৃদয়—
তার এই ভালোবাসা
ভুলিবার নয়।
দেবতারে ভক্তিভরে নতি করে
বধূ সাহানার তরে তাঁর কৃপাকণা
মাগিয়া নিলাম—
অন্তরের অফুরান স্নেহ
তারে দানিলাম!

চরম সত্য

১

সেদিন ছিলেম কবি
আজকে হলেম ছবি
জীবনের এই চরম সত্য
নিত্য মনে ভাবি!
আসা-যাওয়া এই দুনিয়ায়
তাঁরই খেলা সবই।

২

আজকে আমি মানুষ
ছুটছি খেলছি চলছি
কত কথাই বলছি
দু'দিন পরে ছবি হয়ে
ওই দেয়ালে ঝুলছি!
আজকে যেটা সত্য
কাল সেটা অনিত্য—
মায়ার জগৎ সৃষ্ট যাঁহার
তিনিই শুধু নিত্য!

৩

মন্দিরের মাঝে শ্রেষ্ঠ
দেহ-মন্দির—
আশ্রম মাঝারে শ্রেষ্ঠ
আপনার নীড়,
দেবগণ মাঝে শ্রেষ্ঠ—
জনক-জননী,
তাঁদের সেবারে শ্রেষ্ঠ
পূজা বলি মানি!

৪

দেবার যিনি তিনিই দেবেন
কে-বা দেবে আর—
পাবার যাহা তাহা পাবোই
ঠেকায় সাধ্য কার?

৫

মনের জগৎ মনেতে সৃষ্ট
মনেতেই সদা রয়—
মন হারালেই জগৎ হারায়
সব হয়ে যায় লয়!

শুভেচ্ছা

১

হে নব অতিথি
বীজ হতে অঙ্কুরিত হয়ে
প্রকাশিত হলে এ ধরায়-
বিধাতার আশিস লভিয়া
ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে
সার্থক হইয়া ওঠ
নিজ মহিমায়!

২

হে নবীন প্রাণ,
জন্ম লভিয়াছ এ ধরায়
পিতা-মাতা উভয়ের স্নেহের ছায়ায়—
বিধাতার আশিস লভিয়া
ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে
সার্থক হইয়া ওঠ নিজ মহিমায়!

৩

অমৃত-সন্তান তুমি,
জান না নিজেরে—
মানব-জন্মের সার্থকতা লভিবারে
এই আপ্তবাণী
আজি দিনু তব করে!

৪

সংসার-জীবনে লব্ধ
বহুতর আনন্দ-বেদনা
আর অভিজ্ঞতা
"কাব্যতরী" মাঝে যাহা
রহিয়াছে গাঁথা—
তাহা হতে লভি জ্ঞানরাশি
তোমার জীবন-পুষ্প
উঠুক বিকশি!

৫

ঘনঘোর কলির তমসাচ্ছন্ন সংসার মাঝারে
দুঃখ-বেদনায় ভরা মানব-জীবন
শান্তি লভিবারে—
অমূল্য এ গ্রন্থখানি আজি
দিনু তব করে!

৬

এ ঘোর কলিতে আদর্শ-বিস্মৃতা
নারীদের মাঝে
নারীর আদর্শ-রূপ—
আত্মত্যাগ-ধৈর্য-সেবা-সন্তোষ
শিখাতে আসিয়াছিলেন যিনি
মানবীরূপেতে এ মরজগতে—
তাঁরই পূত জীবনখানিরে
তুলিয়া দিলাম তব করে
অনুরাগ ভরে।

৭

বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায়
আজিকার এই শুভদিনে—
মিলিত হয়েছ দোঁহে
যুগল মিলনে!
সংসার জীবন-পথে
চলিতে চলিতে—
দুঃখে-সুখে চিরদিন
থেকো একই সাথে।
তাঁহারে স্মরণে রাখি
জীবন-মরণে—
থেকো সংসারেতে দু'জনায়
শান্ত মনে।